15578
১২০/বা:
১৬/৬/২০০১

কাব্যপরিক্রমা · অজিতকুমার চক্রবর্তী

কাব্যপরিক্রমা

অজিতকুমার চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ ১৩২২

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪০

বিশ্বভারতী সংস্করণ কার্তিক ১৩৫১

পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০

শকাব্দ ভাদ্র ১৮৮০ : বঙ্গাব্দ ১৩৬৫

৯২০/বা:

©

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

১·১

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রায় সকল প্রবন্ধই প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গত তিন-চারি বৎসরের মধ্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথের যে-সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকের আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আমার এই প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রকাশকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রিয়বন্ধু কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া আমাকে স্নেহঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। কাশীপরিক্রমা, ব্রজ-পরিক্রমা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের নাম আছে। আমরা যে রবীন্দ্রকাব্যতীর্থ পরিক্রমণ করিতেছি তাহার এই সামান্য বৃত্তান্তের নাম কাব্যপরিক্রমা রাখিয়া আমার বন্ধু আমার তীর্থপরিক্রমণ সার্থক করিয়াছেন।

কাব্যের আলোচনার মধ্যে জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্র প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থের আলোচনা অসংগত বলিয়া কোনো কোনো পাঠকের মনে হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থের আলোচনাকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাঁহার কাব্যের আলোচনা সম্ভাবনীয় নহে।

ধর্মসংগীত-শীর্ষক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ডে অবস্থিতি-কালে তথাকার সাহিত্যিক ও গুণীজনের দ্বারা তাঁহার বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হইবার উপলক্ষে রচিত হয়। ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণে উহা প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রবন্ধ জীবনদেবতা সম্বন্ধে একটু নিবেদন আছে। জীবন-দেবতার তত্ত্ব সম্যক্‌ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অনেকে উহা নিতান্ত অলস কল্পনামাত্র মনে করেন। একালের জীবতত্ত্বে অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা হইতে মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের মূল ও মানবচৈতন্য সম্বন্ধে যে-সকল নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে, জীবনদেবতার ভাবের সহিত তাহাদের

সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার প্রসঙ্গে সেই-সকল তত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। রসাত্মক কাব্যের রস-প্রসঙ্গে এরূপ জটিল তত্ত্বের কচকচি অনেকের নিকটে অপ্রীতিকর হইতে পারে। আশা করি তাঁহারা আমাকে দয়া করিয়া সহ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী

যে-সকল রসতৃষার্ত পথিক
রবীন্দ্রকাব্যতীর্থ
আমার পূর্বে পরিক্রমণ করিয়াছেন
আমার সঙ্গে বর্তমানে করিতেছেন
এবং আমার পরে অনাগতকালে করিবেন
তাঁহাদের হাতে
একজন পথিকের
এই বৃত্তান্ত
সাদরে
উপহৃত
হইল

নং…
তাং…

জীবনদেবতা	৯
রাজা	৩৩
ডাকঘর	৫৪
জীবনস্মৃতি	৭০
ছিন্নপত্র	৮১
ধর্মসংগীত	৮৯
গীতাঞ্জলি	১০১
গীতিমাল্য	১২১

জীবনদেবতা

মানুষের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল যখন ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা বিশেষ বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের অধিকারের অন্তর্গত ছিল; বংশানুক্রমে তাহারাই সে বিদ্যার চর্চা করিত এবং তাহাকে নিজেদের বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া কল্পনা করিত। এখন নাকি গণতন্ত্রের যুগ, এখন সকলেরই সব বিষয়ে অধিকার। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাকেও প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ মেলামেশা করিতে হইতেছে। ধ্যানের অভ্রভেদী শিখরে তাহারা আর অনধিগম্য হইয়া নাই, তাহারা এখন সমতলে নামিয়া আসিয়া ধারার সঙ্গে ধারাকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানেই এইরূপ সংগম হইতেছে সেখানেই মানুষ তাহাদের মধ্যে একটি আশ্চর্য অভাবনীয় রূপ দেখিতেছে। সেখানেই তীর্থ, কারণ সেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ লুপ্ত হইয়া ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ প্রকাশমান হইতেছে।

হুইট্‌ম্যানের একটি কবিতা আছে, তাহার নাম : There was a child went forth everyday— একটি শিশু প্রত্যহ বাহির হইত। কবি বলিতেছেন, সে যাহাই দেখিত তাহাই হইত। প্রভাতের সূর্যোদয়ের অরুণচ্ছটা, পুষ্পের সৌন্দর্য, বিহঙ্গের কাকলি, বৃক্ষলতা, সকল ঋতুর সকল আশ্চর্য দান, ফলশস্যের বিচিত্র সম্ভার, শহরের রাজপথের লোকারণ্য, গৃহের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, পৌরবর্গ— সকল দৃশ্য, সকল শব্দ, সকল ভাব, সকল অনুভাব তাহার অঙ্গীভূত অংশীভূত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রত্যহই এই-সমস্ত গ্রহণ করিত, সে প্রত্যহই বাহির হইত।

কবি-কথিত এই শিশুটি কে? কে বাহির হইয়াছে? আধুনিক মানুষ। যে সব চায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যাহা-কিছু আছে, মানুষের সমাজে যাহা-কিছু হইতেছে, সে-সমস্তই 'আমার' এই চিহ্নে সে চিহ্নিত করিয়া দিতে চায়। শুধু 'আমার' বলিয়া সে ক্ষান্ত নহে; সে-সমস্তই তাহার 'আমি',

তাহারই ব্যাপ্তি, তাহারই বহিঃপ্রকাশ— এতবড়ো কথাটা না বলিলে তাহার চলে না। 'আমার' বলিলে সেগুলি বাহিরের বিষয়সম্পত্তির মতো মনে হয়, কিন্তু 'আমি' বলিলে আর তো কোনো কথা নাই। তখন তাহাকে বিভক্ত করিবে কে, খণ্ডিত করিবে কে ?

সমস্তকে যে নিজের চেতনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখা চাই— এ ভাব এ যুগের মানুষের মধ্যে ফুটিল কেমন করিয়া ? ফুটিল, যতই বিদ্যাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ প্রশস্ততর হইতে লাগিল, বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন, দর্শনের সঙ্গে শিল্পসাহিত্য যতই ক্রমশ সাহচর্যে ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে দীক্ষিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক বিদ্যার পন্থা, প্রকরণপদ্ধতি এবং আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের কাজ একই। মানুষের মনের ক্ষেত্রকে, চেতনার পরিধিকেই তাহারা বিস্তৃততর করিয়া দিতেছে। সুতরাং তাহারা যে যাহাই অন্বেষণ করুক এবং যে যাহাই সিদ্ধান্ত স্থির করুক, তাহারা মানুষের মনকেই নানা দিক দিয়া নাড়া দিয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছে, এবং সেজন্য প্রত্যেক বিষয়েই যে সেই মনঃশক্তির বল ও প্রসারই বাড়িয়া যাইতেছে. এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র ভাবের অনেক সাক্ষ্য যে আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে পাওয়া যায়. অর্থাৎ এ আইডিয়াটা যে আধুনিক কালেরই একটি বিশেষ জিনিস, তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। আমি জানি যে, কবিতার মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসরণ করার বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই। কারণ, কবিতা তো তত্ত্ব নয়, সে প্রকাশ। কবিতা তত্ত্বকে তো প্রমাণ করে না, সে তত্ত্বকে রূপ দান করে। সব সময় যে তাও করে তাহা নহে— তত্ত্ব হোক বা না হোক, একটা-কিছু যে-কোনো রসবস্তুকে সে আপনার কল্পনার ও ভাবের ছাঁচে ফেলিয়া একটি সুষমাময় রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই খুশি হয়। সে ভাবকে চায় না, অভাবনীয়কে চায় ; নির্দিষ্ট

তত্ত্বকে চায় না, অনির্বচনীয়কে চায়। এইজন্যই, সে যে রসরূপের সৃষ্টি করে তাহার মধ্য হইতে তাহার আসল ভাবটা কী তাহা উদ্ধার করা এত কঠিন হয়। মুখের মধ্যে যেমন মনের নানা ভাবের আলোছায়াপাত দেখা যায়, কবিতার মধ্যে তেমনি ভাবের নানা ইশারা-ইঙ্গিত মাত্র দেখা যায়, কিন্তু তার বেশি নয়। সুতরাং দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে মিলাইতে গেলে অত্যন্ত অসংগত একটি কাণ্ড ঘটে।

এ-সকল কথা মানিয়া লইলেও বলিতে হয় যে, কবিতার মধ্যেও সত্য আছে, সে যে কেবলই মায়ার সৃষ্টি তাহা নহে। আমাদের মনের নানান মহালে যে সত্যের নূতন নূতন রূপ। কোনোটা বা মস্তিষ্কের মহাল, কোনোটা বা হৃদয়ের মহাল, কিন্তু এই বিচিত্রতায় সত্য কিছু বিভিন্ন হইয়া যান না। ইশারায় বলিলেও সত্য, কূটতর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া বলিলেও সত্য, প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা যন্ত্র দ্বারা দেখাইলেও সত্য। জগতের রূপ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, সুতরাং তাহা মিথ্যা, জগতের বাস্তবিক সত্তার মধ্যে রূপের কোনো সদ্ভাব নাই— এ কথা যত বড়ো দার্শনিকই বলুন না কেন, ইহা সত্য নয়। কারণ, রূপ শুধু চোখে দেখিবার ও ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিবার জিনিস হইলে মানুষ কখনোই বলিত না 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' রূপের মধ্যেই যে অরূপের বাসা, সে যে ভিতরেরই বাহির, সত্তারই প্রকাশ। কবিতা শুধুই প্রকাশ, আর কিছুই নয়, এ কথা তেমনিই সত্য নহে— কারণ, কবিতাও সত্যেরই প্রকাশ। সুতরাং 'জীবনদেবতা'র আইডিয়ার সঙ্গে যদি দর্শনবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখা যায় তবে ইহাই বলিব যে, এ আইডিয়াটি সত্য, এ নিছক কল্পনা নয়। কবি এই সত্যকে অনুভূতির দিক হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তিনি ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তত্ত্ব গড়েন নাই।

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ে অবতরণ করা যাক।

একসময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র-স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। ·· তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম।··· মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।'

সকলেই জানেন যে, কবির 'জীবনদেবতা'-শীর্ষক কবিতাগুলিতে শুধু নয়, 'বসুন্ধরা' 'প্রবাসী' প্রভৃতি আরও অনেক কবিতায়, এই পত্রে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে সেই ভাবের কথাই পাওয়া যায়। কবি বলেন যে, আমাদের এই বর্তমান জীবনের মধ্যে একটি চিরন্তন জীবন আছে। আমার যে জীবন কত যুগ পূর্ব হইতে কত বিচিত্র জীবনপর্যায়ের ভিতর দিয়া আমার এই বর্তমানতায় আসিয়া আজ পৌঁছিয়াছে, আমার সেই জীবনই আমার অন্তর্নিহিত চিরন্তন জীবন। কবি তাহারই আশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলেন, 'যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে' এবং 'স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে'। এবং এই ক্ষণিক জীবনের স্বল্পপরিসর চেতনার মধ্যে সেইজন্যই তিনি বিশ্বচেতনাকে এক একসময় অনুভব করিয়া থাকেন।

ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদে বলে যে, এক আদিম জীবকোষ হইতে

এই নানা বিচিত্র জীবদেহ-সকল উদ্ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে কথা অধুনা সকলেই দেখিতেছি মানেন। আদিম অ্যামিবা (amœba) এবং জটিল মানবদেহ একই উপাদানে গঠিত, একই জীবকোষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। এই জীবকোষ বা প্রোটো-প্ল্যাজমিক সেল ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর ব্যূহ রচনা করিয়া জীবকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছে। মানুষের শরীরে, বিশেষভাবে মানুষের মস্তিষ্কে, ইহার জাল যেরূপ ঘন এবং ক্রিয়া যেরূপ দ্রুত ও গতিশীল এমন অন্য জীবদেহে বা জীবমস্তিষ্কে নহে ; আর সেই-জন্যই মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব হইয়া উঠিয়াছে।

ডারুইন, ওয়ালেস প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের এই-সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি লক্ষিত হয় না। মানুষ যে বিচিত্র জীবজন্মের মধ্য দিয়া সম্ভাবিত হইয়াছে, এ কথাটা সত্য বলিয়া মানা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং ডারুইনের এই মত আশ্রয় করিয়া কেহ যদি বলেন যে 'আমি এক সময় গাছ ছিলাম' তবে শুনিতে যতই অদ্ভুত লাগুক, রাগ করা মূঢ়তা এবং উপহাস করা ততোধিক মূঢ়তা।

কিন্তু এ কথাটা যে অনেকের অদ্ভুত লাগে তাহার কারণ ইহা নয় যে, বৃক্ষজীবনের মধ্য দিয়া ক্রমে মনুষ্যজীবনের অভিব্যক্তি হইয়াছে এই সিদ্ধান্তটি কোনো মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহার আসল কারণ এই যে, মানুষ বলিতেছে 'আমি গাছ হয়ে উঠেছিলুম'— 'আমি' উঠেছিলুম এই বোধটা। আরও অধিক কারণ এই যে, সে কথাটা সেই মানুষের আবার 'অল্প অল্প মনে পড়ে'।

'আমি গাছ হয়ে উঠেছিলুম' বলিলে বুঝায় যে 'আমি'র ধারাটা যেন গাছ পর্যন্ত প্রবাহিত, অর্থাৎ গাছের মধ্যেও এই আমি-বোধটা কোনো-না-কোনো আকারে ছিল। অথচ তাহা কেমন করিয়া হয় ? আমি-বোধটা তো অচেতন বোধ নয়, সংস্কারমাত্র নয়, সে পূর্ণ সচেতন বোধ।

প্রকৃতিরাজ্যে এ বোধের স্থান নাই; কারণ, সেখানে সমস্তই নিয়মে চলে, অন্ধ-সংস্কারের বশবর্তী হইয়া চলে। স্বাতন্ত্র্যবোধের কোনো স্থানই সেখানে নাই।

তার পর সেই পরিচয়ের কথা 'অল্প অল্প মনে পড়ে'— এ কথারই বা অর্থ কী? আমাদের স্মৃতি কতদূর পর্যন্ত যায়? এই কয়েক বৎসরের জীবনে আমাদের মধ্যে যত বস্তু, যত ভাব ও অনুভাব, যত কল্পনা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বারো-আনা অংশ ভুলিয়াছি, এবং কেবল চারি-আনা অংশের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া আসিয়াছি বলিয়া বাল্যের সঙ্গে যৌবনকে, যৌবনের সঙ্গে বার্ধক্যকে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারিতেছি। পৈতৃক নানা সংস্কার তো আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু তাহার সবগুলি কি আমাদের জ্ঞাত? যে-সকল স্মৃতির উপর সেই সংস্কারের ভিত্তি সে-সকল স্মৃতির কোনো বার্তাই কি আমরা জানি? পিতা গেলেন; তার পর পিতামহ— তখন তো আরও অজ্ঞাত। প্রপিতামহ আরও অজ্ঞাত। ক্রমে ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে গিয়া নিজের বংশের আদিপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছিলাম। তারপর তাঁহাকে ছাড়াইয়া নিজের জাতির আদিপুরুষ পর্যন্ত গেলাম। ধরো প্রথম আর্যপুরুষ যিনি ছিলেন তাঁহার কথাই কল্পনা করি। তাঁহার সম্বন্ধে স্মৃতি তো দূরের কথা, তাঁহা হইতে আগত কোনো সংস্কারের সংবাদ কি আমি জানি? তার পর আরও যুগ যুগ পূর্বে প্রথম মানব, তার পর যুগ যুগ পূর্বে নানা জীবপর্যায়, তার পর আরও কত যুগ পূর্বে উদ্ভিদপর্যায়— তার পর সেই কোন্ আদিম যুগে সেই প্রথম তরুটি— তাহার কথা 'অল্প অল্প মনে পড়ে' এ কথাটা কি কেহ দিবালোকে বসিয়া কল্পনা করিতে পারে, না লিখিতে পারে? এক পুরুষের স্মৃতিই যখন থাকে না তখন যুগযুগান্তর পূর্বের স্মৃতি থাকে এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়? তবে কবিত্বের মদ্য পান করিলে এবং কল্পনার গঞ্জিকা সেবন করিলে সমস্তই সম্ভব হয়। সাধে শেক্‌স্‌পীয়র

The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact

বলিয়াছেন ? সুতরাং কবি যদি বলেন যে, আমি একসময়ে 'গাছ হয়ে উঠেছিলুম' এবং সে কথা আমার 'অল্প অল্প মনে পড়ে' তবে শেক্‌স্‌পীয়রের ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া কথাটাকে তলাইয়া ভাবিয়া দেখিবার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। ও আবার একটা কথা !

অথচ অভিব্যক্তিবাদের আদিগুরু ডারুইন এবং তাঁহার পরবর্তী তাঁহার চেলারা, যাঁহারা পোস্ট-ডারুইনিয়ান্‌স্‌ নামে খ্যাত তাঁহারা, এই কথাটাকেও যে স্থানে স্থানে আমল না দিয়াছেন এমন নয়। আমি বলিয়াছি যে, কবির কল্পনা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমর্থন করেন, এমন ব্যাপার এ যুগের পূর্বে আর ঘটে নাই। এ যুগে হইলে মহাকবি শেক্‌স্‌-পীয়র অমন নিশ্চিন্ত মনে কবির সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটি বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কারণ এ যুগের মহাকবি স্পষ্টই উলটা কথা লেখেন ; তিনি বলেন—

A poet never dreams :
We prose folk do : we miss the proper duct
For thoughts on things unseen. —Browning

অতএব এ যুগের মহাকবির এই আশ্বাসবাক্যকেই শিরোধার্য করিয়া লইয়া দেখা যাক, কবিকথিত আদিম যুগে এই গাছ হইয়া উঠার ব্যাপার এবং সেই যুগান্তরের স্মৃতিকে বহন করিবার ব্যাপারের মধ্যে ডারুইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কী সত্য নির্ধারণ করিতেছেন। ডারুইনের পরে ক্রমে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের লেখার মধ্য হইতে এই ভাবের সমর্থনকারী কথা-সকল আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব, তাহা প্রবন্ধা-রম্ভেই বলিয়াছি।

প্রত্যেক মানুষ যে একটিমাত্র ব্যক্তি নয় কিন্তু অনেক ব্যক্তিত্বের সমষ্টি

এবং এই প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বের যে স্বতন্ত্র বুদ্ধি ইচ্ছা স্মৃতি ও সংস্কার রহিয়াছে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব এমনতর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডারুইন এই কথাটিকে নানা স্থানেই মানিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। তিনি বলেন—

An organic being is a microcosm, a little universe, formed of a host of self-propagating organisms, inconceivably minute and numerous as the stars in heaven.

অর্থাৎ, বিচিত্র অঙ্গ-বিশিষ্ট দেহী একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডবিশেষ, তাহা স্ব-স্ব প্রধান বহু দেহের সমষ্টি দ্বারা গঠিত এবং সেই দেহগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহারা ধারণার অতীত এবং আকাশের তারার ন্যায় অগণিত।

আর-এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন, শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই এ কথা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেহের নানান অঙ্গ-সকলের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে— প্রত্যেকটি জীবকোষের কর্ম সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে; সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর ভর করিয়াই বলা যায় যে, প্রত্যেকটি জীবকোষ একটি স্বপ্রধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি— ইত্যাদি।

জীবকোষের স্বাধীন অস্তিত্বের মত বহু পূর্ব হইতেই বৈজ্ঞানিকসমাজে চলিয়া আসিতেছে; ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেকটি স্নায়ুকেন্দ্রে (nervous centre) স্মৃতি স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। যেমন, আঙুলে ঘা হইয়াছে, ঘা সারিয়া যাইবার পরে ক্ষতের চিহ্নিত স্থানটা শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। তাহার অর্থ এই যে, সেই চিহ্নিত অংশটুকুর মধ্যে ক্ষতের স্মৃতি জাগরূক হইয়া থাকে। এ তো একটা সহজ প্রমাণ, এরূপ নানা প্রমাণের দ্বারা শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং এই-সকল প্রমাণসহায় হইয়াই প্রত্যেকটি জীবকোষ যে একটি স্বপ্রধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি ডারুইন এ মতটিও প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আমাদের মধ্যে এই বহু ব্যক্তির সমাবেশের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আরও অনেক কথার আলোচনার মধ্যে যাইতে হয়। আমরা

দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যখন জন্মলাভ করে তখন হইতে তাহার সকল জীবনী-ক্রিয়া এমন সহজভাবে সম্পাদিত হয় যে তাহার কোনো চেষ্টা খাটাইবার বা বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজনই হয় না। শিশু অনায়াসে নিশ্বাস গ্রহণ করে, মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ চুষিয়া লয় এবং গলাধঃকরণ করে, পরিপাক করে, কানে শোনে, চোখে দেখে ইত্যাদি— কিন্তু এতগুলা কার্য সে যে আপনিই করিতে পারে ইহার কারণ কী? ইহার কারণ, এগুলি সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে আসিয়াছে। আর আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, যখনই কোনো কার্য এরূপ অভ্যাসগত হইয়া যায় যে আর চেষ্টা বা চিন্তা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনমাত্র থাকে না তখনই তাহা যথার্থরূপে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু সেরূপ সংস্কার দাঁড় করানো কি এক-আধ দিনের কাজ? তাহার জন্য বহু বৎসর, হয়তো বহু যুগও লাগিতে পারে। অতএব শিশুর জীবনী-প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক কালের অভ্যাসের ফলস্বরূপে সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই জীবনচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। এখন এই সংস্কারকে যদি পূর্বপুরুষের সংস্কার বল তবে তাহা অসংগত হয় না; যদিচ বৈজ্ঞানিকভাবে বলিতে গেলে এই কথাই বলা উচিত যে, তোমার বিশেষ বিশেষ জীবকোষ বহুকাল ধরিয়া এই এক ধরনের জীবনচেষ্টায় অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং এই-সকল অভ্যাসের স্মৃতি তাহার মধ্যে সংস্কারের আকার ধারণ করিয়াছে।

সুতরাং ডারুইন যখন বলিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বিদ্যমান, প্রত্যেক জীবকোষই এক-একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তি, তখন তাহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি জীবকোষ আপনার বিশিষ্টতার একটি ধারাকে তাহার আরম্ভকাল হইতে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করা ভুল হইবে যে, সেই বহুপূর্বেকার কোনো জীবকোষ এবং এখনকার জীবকোষ একই বস্তু, তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ঘটে নাই। কত লক্ষ লক্ষ জন্মের

স্রোতের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রবাহিত হইতে হইয়াছে, বাহিরের কত অবস্থার বিপর্যয়, কত পরিবর্তনপরম্পরা তাহাকে আঘাত করিয়াছে, সুতরাং যে জীবকোষ সেই আদিম কোন্ যুগে আপনার জীবনলীলা শুরু করিয়াছিল সে যে আজিও সেই একইভাবে বর্তমান রহিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়?

তথাপি অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা রহিয়াছে এবং সে যে তাহার জীবনী-ক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারকেও বহন করিয়া চলিয়াছে, যেজন্য তাহার প্রাণরক্ষিণী ক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইতেছে, সে বিষয়ে আর ভুল নাই।

ইহার আর-একটি প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান প্রমাণ ভ্রূণতত্ত্বে (embryology) পাওয়া যায়। একটি উন্নত জীব অভিব্যক্তির যে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, গর্ভে অবস্থান-কালে তাহার ভ্রূণ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই অবস্থার রূপ পরে পরে ধারণ করে। গোড়ায় তাহাকে অ্যামিবা বা মৎস্যজাতীয় জীবের ন্যায় দেখিতে হয়, তার পর সরীসৃপের মতো, তার পর পাখির মতো, এমনি করিয়া নানা আকারের ভিতর দিয়া সে নিজের বিশিষ্ট দেহ লাভ করে। এই মতটিকে সে শাস্ত্রে বলে recapitulation theory অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির মত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন কোনো জীবের ভ্রূণ এই-সকল অবস্থার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিবে? তাহার সে-সব পূর্বপুরুষের সঙ্গে তাহার তো শ্রেণীগত পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। স্যামুয়েল বাট্‌লার নামক বিখ্যাত ডারুইন-শিষ্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

If the germ of any animal now living is but part of the personal identity of one of the original germs of all life whatsoever, and hence, if any now living organism must be considered as being itself millions of years old, and as imbued with an intense though

unconscious memory of all that it has done sufficiently often to have made a permanent impression, if this be so, we can answer the above question perfectly well. অর্থাৎ, এখনকার কোনো জীবিত প্রাণীর বীজকে যদি সেই বিশ্বজীবন-ধারার কোনো আদিম বীজের সঙ্গে আংশিকভাবে এক বলিয়া ধরা যায় এবং সেই হেতু যদি এই বর্তমান জীবিত প্রাণীকে কোটিবৎসর-বয়স্ক বলিয়া মনে করা যায় এবং মনে করা যায় যে, সে এই সুদীর্ঘকাল এমন-সকল কাজ করিয়াছে যাহা তাহার মধ্যে চিরকালের মতো মুদ্রিত হইয়া আছে, আর সেই নিগূঢ় অথচ নিশ্চেতন স্মৃতিতে সে পরিপূর্ণ, তবেই ঐ উপরের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর প্রদান করা যাইতে পারে।

তার পরেই তিনি বলিতেছেন—

I suppose, then, that the fish of fifty million years back and the man of to-day are one single living being in the same sense or very nearly so, as the octogenarian is one single living being with the infant from which he has grown.

অর্থাৎ, আমার তাই মনে হয় যে, পাঁচ কোটি বৎসর পূর্বের যে মৎস্য এবং আজিকার যে মানুষ সে একই অখণ্ড প্রাণী; যেমন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ তাহার আপনার শৈশবকালের শিশুর সঙ্গে একই ব্যক্তি।

স্যামুয়েল বাট্‌লার ডারুইনের ঐ জীবকোষের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্বের মতটিকে এই দিক দিয়া মানেন যে, তাহার মধ্যে যেটা ইন্‌স্‌-টিঙ্‌ক্‌ট্‌ অর্থাৎ সংস্কার সে তাহার বহুযুগের সঞ্চিত স্মৃতি বই আর কিছুই নহে। তিনি ইন্‌স্‌টিঙ্‌ক্‌ট্‌কে বলেন inherited memory এবং unconscious memory, অর্থাৎ পূর্বপুরুষাগত স্মৃতি এবং সুপ্ত স্মৃতি বই সংস্কার আর কিছুই নয়। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, যখন জীবকোষগণ কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া এমন একটি সংস্কারের

ধারা অনুসরণ করে যাহার সঙ্গে অন্য শ্রেণীর প্রাণীর সংস্কারের ধারার একেবারে মিল হয় না, তখন সেই ভিন্নশ্রেণীয় (species) প্রাণীদিগকে জোর করিয়া মিলাইলে তাহাতে অত্যন্ত কুফল দৃষ্ট হয়। কাছাকাছির মধ্যে বর্ণসংকর চলে, অত্যন্ত দূরবর্তীদের মধ্যে চলে না। স্যামুয়েল বাট্‌লার বলেন যে, তাহার কারণ, দূরবর্তীদের মধ্যে স্মৃতির ধারা উলটা ও বিপরীত, সেইজন্য তাহাদিগকে বলপূর্বক মিলাইলে স্মৃতিভ্রংশ হইয়া যায় এবং সেইরূপ দূরসংকরজাত জীব তাহার আদিম অপরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাই হউক, এই unconscious memory অথবা নিশ্চেতন স্মৃতির মতকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রযত্ন করিয়াছেন বলিয়াই স্যামুয়েল বাট্‌লারের নাম পশ্চিমদেশে বিখ্যাত।

ডারুইন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের এই মতটির সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

বৈজ্ঞানিক চক্ষে ডারুইন দেখিলেন, প্রত্যেক জীবকোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, সুতরাং একই মানুষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে, অথচ তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ হয় নাই, একই অখণ্ড জীবনের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। কবির অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন, বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানা ধারায় তাঁহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে; অথচ তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ হয় নাই— একই অখণ্ড 'জীবনদেবতা' তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন।

আজ মনে হয়, সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি,
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।

ডারুইন-শিষ্য স্যামুয়েল বাট্‌লার দেখিলেন, প্রত্যেক জীবকোষের অখণ্ড ধারা যে একই সংস্কারের পথ অনুসরণ করিয়া চলে, তাহা তাহার বহুযুগের অভ্যস্ত জীবনী-ক্রিয়ার স্মৃতি বই আর কিছুই নয় এবং জীবভ্রূণে অভিব্যক্তির নানা অবস্থার পুনরাবৃত্তির মধ্যেও সেই স্মৃতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়; সুতরাং জীবকোষের ধারা একটি যুগযুগান্তরের অভ্যাসগত সুপ্ত স্মৃতিরই ধারা। কবি রবীন্দ্রনাথও অনুভব করিলেন যে, সেই নানা সুপ্ত স্মৃতি তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব বিশ্বৈক্যানুভূতির সৃজন করিয়াছে। এ অনুভূতি কল্পনা নয়, এ সত্য যে—

দেখি চারি দিক পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে।
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে।…
হে চিরপুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।…
প্রাচীনকালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমারি স্মৃতি।
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নীতি।…

প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।

শুধু স্যামুয়েল বাট্‌লার যে এই সুপ্তস্মৃতির মত প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, আধুনিক মনস্তত্ত্বে subliminal consciousness অর্থাৎ মগ্নচৈতন্য বলিয়া একটা কথা বলে। অর্থাৎ, আমাদের চৈতন্যের সবটাই আমাদের কাছে প্রকাশ নয়, অনেকটাই অপ্রকাশ। অপ্রকাশ বলিয়াই যে তাহা অনুপস্থিত এবং তাহার কোনো কাজ নাই, এমন কথা বলা চলে না। এ কিরকম? না, উপমাচ্ছলে বলা যায় যে, সমুদ্রের তলে যে-সব দেশ তৈরি হইতেছে তাহারা যেমন অগোচর, এই মগ্নচৈতন্যও তেমনি অগোচর। দূর হইতে কুহেলিজড়িত বিশাল এক নগরের ক্ষীণাভাসে যেমন সবই অস্পষ্ট নয়, মধ্যে মধ্যে দুটা-একটা সমুচ্চ চূড়া, দুটা-একটা বড়ো বড়ো কীর্তিচিহ্ন যেমন দেখা যায়, অথচ আর সবই ছায়াময়, মগ্নচেতনার রাজ্য কতকটা সেইরূপ।

যদি অভিব্যক্তিবাদ মানি, এবং যেরূপ দেখিলাম যদি জীবনের ও জীবনী-ক্রিয়ার অভ্যস্ত স্মৃতির অখণ্ড ধারাকে মানি, এবং মানি যে, আমাদের মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের সমাবেশ সেই অভিব্যক্তির সূত্রে ঘটিতে পথ পাইয়াছে, তবে এ কথা না মানিয়া কোথায় যাইব যে আমাদের চেতনাও অনবচ্ছিন্ন? তার মানে আমাদের যেটুকু চেতনা স্বাধীনভাবে আপনার বুদ্ধি ও ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেছে তাহার অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড চেতনা পূর্বস্মৃতির সংস্কারকে বহন করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং প্রচ্ছন্নভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছে। জন্ম মানেই একটা নূতন করিয়া আরম্ভ করা, সুতরাং সেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মগ্ন-চেতনার যুগযুগান্তরগভীর অতলতার উপরে একটুখানি দ্বীপের বেষ্টনের

মধ্যে সচেতন হইয়া জাগিয়া উঠি এবং সেই অল্প একটু সচেতনতাকে সমগ্র চেতনা বলিয়া ভ্রম করি। একজন লেখক বলিয়াছেন—

Birth is the end of that time when we really knew our business, and the beginning of the days wherein we know not what we would do.

জন্ম হইতেছে একটা কালের শেষ যখন আমরা আমাদের কার্য কী তাহা জানিতাম এবং অন্য এক কালের আরম্ভ যখন আমরা জানি না আমরা কী করিব? সুতরাং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন জীবনধারার কথা, অথবা যাহা একই কথা, জীবনদেবতার কথাকে ভুলিয়া যদি বর্তমান জীবনকেই একান্ত করিয়া আমরা দেখি, তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই।

এই মগ্নচেতনার তত্ত্বকে মানিলে স্মৃতি সম্বন্ধেও আমাদের পূর্বের সংস্কারকে ভাঙিতে বাধ্য হইতে হয়। দেখা গিয়াছে যে, বহু পুরাতন স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হয় না, যদিচ বহুকাল পর্যন্ত তাহার অস্তিত্বের কোনো চিহ্নমাত্র থাকে না। হয়তো একটা গন্ধ একজন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধকে বাল্যের এমন কোনো ঘটনা মনে করাইয়া দেয় যাহা তাহার মনে পড়িবার কোনো কারণই ছিল না। প্রত্যেকের জীবনের কতকগুলি বাঁধা অভ্যাস আছে এবং সেই বাঁধা অভ্যাসের স্মৃতি তাহার মধ্যে দিব্য জাগরূক থাকে। অথচ যখন এমন কোনো স্মৃতি মানুষের মনে পড়ে যাহা ভাবের অনুবন্ধিতার নিয়মে তাহার পরিচিত অভ্যাসের কোথাও ধরা দেয় না, তখন তাহা কোনো একটি ইঙ্গিতে (suggestion) মগ্নচেতনার রাজ্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছে ছাড়া আর কী কারণ নির্দেশ করা যায়? সুতরাং স্মৃতি যে কত দীর্ঘকাল পর্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়া আবার জাগ্রত হইতে পারে তাহা হিসাব করিয়া নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জড়বস্তুর মধ্যেও স্মৃতির সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন। যে জায়গায় কোনো একটা ধাতুপদার্থ

একসময়ে আঘাত পাইয়াছে, বহু বৎসর পরে সেই জায়গায় সেই আঘাতের স্মৃতির পরিচয় সে প্রদান করিয়া থাকে। ইহা যদি সত্য হয় তবে বুঝা যাইবে যে, জাগ্রৎ চেতনার রাজ্যেই যে স্মৃতির ষোলো-আনা আধিপত্য তাহা নহে, সুপ্ত বা মগ্নচেতনালোকে তাহার আধিপত্য বড়ো সামান্য নহে। অর্থাৎ, জাগ্রৎই বলি বা সুষুপ্তই বলি, সমস্ত চেতনাই এক অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন চেতনা। যতদূর দেখা যাইতেছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান এই কথাটা প্রমাণ করিবার দিকেই চলিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকজগতে ফেক্‌নার (Fechner) সর্বপ্রথমে এই সত্যটি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশ্বজগতে সর্বত্র সর্ববিষয়ে সমধর্মতা বিরাজমান রহিয়াছে, ফেক্‌নারের ইহাই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, যেমন চোখের সঙ্গে দৃষ্টি, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শ সংযুক্ত রহিয়াছে, অথচ এই-সকল ইন্দ্রিয় বিভিন্ন, ইহাদের চেতনাও বিভিন্ন, যদিও আশ্চর্য এই যে আমাদের মনে এই ভেদ মিলিয়া গিয়া সমগ্র শরীরের এক চৈতন্য অনুভূত হয়— ঠিক তদ্রূপ আমার চৈতন্য, তোমার চৈতন্য, প্রত্যেক মানুষের চৈতন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও অবচ্ছিন্ন হইলেও এক অখণ্ড মানবচৈতন্যের মধ্যে মিলিয়া যায়। মানসচৈতন্য যেমন ঐন্দ্রিয়চৈতন্যের পার্থক্য-সকলকে মিলাইয়া লয়, মানবচৈতন্য তেমনি ব্যক্তিগত মানসচৈতন্যের পার্থক্য-সকলকে মিলাইয়া লয়। মানবচৈতন্য আবার সেই একই প্রণালীতে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতার জীবচৈতন্যে মিলিয়া যায়, জীবচৈতন্য সূর্য প্রভৃতি গ্রহ-মণ্ডলের বিশ্বচৈতন্যে পর্যবসিত হয় ; এইরূপে চৈতন্য 'from synthesis to synthesis and height to height, till an absolutely universal consciousness is reached'— সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হয়, যাবৎ বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা সে লাভ না করে।

ফেক্‌নার চৈতন্যের ক্ষেত্রকে এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত করিয়া দেখিয়া-

ছিলেন বলিয়া পৃথিবীকে তিনি জড়পিণ্ড মনে করিতেন না। তিনি পৃথিবীকে মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণবান চেতনাবান সত্তা বলিয়া বোধ করিতেন। আমাদের শরীরের মধ্যে কত অসংখ্য জীবাণুর কী প্রচণ্ড আন্দোলন রহিয়াছে, অথচ আমাদের শরীর দেখিয়া তাহা কেন বোধগম্য হয় না? শরীর সেই অসংখ্য বৈচিত্র্যকে সরল করিয়া মিলিত করিয়া লইতে পারিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর তো কোনো কারণ নাই। সেইরূপ এই অগণ্য জীবশরীরকে পৃথিবী আপনার বৃহৎ শরীরের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে, তাই সমগ্র পৃথিবীর শরীরে জীবনচাঞ্চল্য কিঞ্চিন্মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের হস্তপদের দ্বারা অঙ্গসঞ্চালন আবশ্যক, পৃথিবীর সেরূপ আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহার হস্তপদ সর্বত্রই; তাহার লক্ষ লক্ষ চক্ষু এবং কর্ণ, সে আপনার অংশবিশেষের অর্থাৎ মানুষের অসম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইবে কেন?

ফেক্‌নারের এই চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষের আইডিয়ার সঙ্গে গীতার 'বিশ্বরূপ'এর এবং উপনিষদীয় 'সর্বভূতান্তরাত্মা'র ভাবের সম্পূর্ণ মিল পাই। বিশ্ব যে সর্বত্র এক চেতনাবান পুরুষের সত্তা দ্বারা ওতপ্রোত এবং আমরা সকলেই যে তাহার অন্তর্গত, এ কথার আভাস উপনিষদের নানা শ্লোকের মধ্যে আছে। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্যপদ্ভ্যাং
পৃথিবীহ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥

অর্থাৎ, অগ্নি (দ্যুলোক) ইহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণদ্বয়। প্রকাশিত বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী অর্থাৎ মাটি উৎপন্না হইয়াছে— ইনি সমুদয় প্রাণীর অন্তরাত্মা।

এ কেবল কল্পনা মাত্র নহে, ইহাও বিশ্বকে সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্যবান

প্রাণবান সত্তারূপে উপলব্ধি, যাহা ফেক্‌নার করিয়াছেন দেখা গেল।

'জীবনদেবতা'র ভাবের সঙ্গে ফেক্‌নারের যে তত্ত্বটি এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলাম তাহার কি খুবই সাদৃশ্য নাই? জীবনদেবতা মানে একটি 'ever-evolving personality'— ক্রমশ উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব। কোন্ আদিম যুগ হইতে এই 'আমি' নামক ব্যক্তিটির প্রথম সূচনা হইয়াছিল তাহা কে জানে! আমার বর্তমান দেহের জীবকোষসমূহের মধ্যে সেই বহু বহু প্রাচীন যুগের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নানা জীব-জীবনযাত্রার সংস্কার-সকল সুপ্তস্মৃতিরূপে আজিও বিদ্যমান, তাহা দেখা গেল। সেইজন্য সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার আপনার এমন একটা অন্তরতম যোগ যে আমি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কল্পনা নয়; ইহা আমার দেহাভ্যন্তরের সমস্ত অব্যক্ত প্রাণের অনির্বচনীয় রহস্যময় স্মৃতি হইতে স্পন্দমান এক আশ্চর্য অনুভূতি।

কিন্তু সেই যুগযুগান্তর হইতে প্রবাহিত এই জীবনধারার অন্তর্নিহিত সত্তাই যদি জীবনদেবতা হন তবে তাঁহাকে আমার বর্তমান আমিত্বের এই খণ্ডচেতনাটুকুর মধ্যে উপস্থিত করিবার এবং উপলব্ধি করিবার কোনো প্রয়োজন তো দেখা যায় না। আমি যে-সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা আবার অতিক্রম করিবার আমার আবশ্যক কী? তরুলতাপশুপক্ষীর সঙ্গে ঐক্যানুভূতির প্রয়োজন কী? তাহা আর কোনো কারণে নয়, কেবল এইজন্য যে, আমি যে মনে করিতেছি যে আমার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আমার যেটুকু জাগ্রৎ চেতনা খেলিয়া বেড়াইতেছে তাহাই আমার সব চেতনা— তাহা প্রকৃতপক্ষেই ভুল। আমার চেতনার ক্ষেত্র যে কোন্ সুদূর অতীত হইতে কোন্ সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত, সে কথাটা বুঝিতেই পারিব না। আমায় তাই এই কথাটি জানিতেই হইবে যে, সেই অখণ্ড-বিশ্বচৈতন্য-লাভ-প্রয়াসী একটি সত্তা আমার মধ্যে চিরকাল ধরিয়া

কেবলি আমার জীবনকে গড়িতেছেন, কেবলি তাহাকে বিশ্বের সঙ্গে নানা সম্বন্ধসূত্রে বাঁধিয়া সকল ভেদসীমা দূর করিয়া দিতেছেন। আমাকে অভিব্যক্তির কত স্তরের মধ্য দিয়া তিনি লইয়া আসিয়াছেন; আমার মধ্যে সেই-সমস্ত জীবনযাত্রার অব্যক্ত সংস্কার মগ্নচেতনালোকে মজুত রহিয়াছে; এখনও এই জীবনেও, যেখানে আমার চেতনার প্রসার ব্যাহত সেইখানে, তাহাকে দূর করিবার জন্য তিনি ভিতর হইতে কেবলি আমাকে বিশ্বের সর্বত্র ঠেলা দিয়া বাহির করিতেছেন। 'There was a child went forth everyday.' তিনিই তো জীবনদেবতা; তিনি চলিয়াছেন 'from synthesis to synthesis and height to height, till an absolutely universal consciousness is reached'— সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে, যে পর্যন্ত না বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করা যায়।—

হে চিরপুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া—
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

ফেক্‌নার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণে ও চৈতন্যে পূর্ণ করিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং আমাদের মানসচৈতন্য যে ক্রমে ক্রমে চক্র হইতে পরিবর্ধিত চক্রে আরোহণ করিয়া সেই বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিতেছে, ইহাও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। অর্থাৎ অভিব্যক্তির আরম্ভ হইতে মানুষ পর্যন্ত, অসংহত জ্যোতিঃপিণ্ড 'নেবুলা' হইতে সুসভ্য মানুষের উদ্ভব পর্যন্ত, যে একটি ধারা চলিয়াছে, মানুষ সেই ধারাটিকেই পুনরায় অনুসরণ করিয়া আপনার সঙ্গে সমস্ত বিরাট বিশ্বের অখণ্ড যোগ অনুভব করিতে চাহিতেছে। যাহা সে হইয়া আসিয়াছে তাহা সজ্ঞানভাবে জানিবে এবং পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবে, ইহাই

তাহার অভিপ্রায়। এইজন্য একসময়ে যাহাকে সে জড় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল আজ তাহারই মধ্যে প্রাণের আশ্চর্য লীলা দেখিতেছে। যাহা বিস্মৃত বিলুপ্ত ছিল তাহা জাগ্রতক্ষেত্রে আসিয়া রহস্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিতেছে। সমস্ত চেতনা যে এক অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন চেতনা, এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিবার দিকে বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সমস্তই এখন প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে।

চেতনা সম্বন্ধে যেমন ফেক্‌নারের তত্ত্ব কী তাহা দেখা গেল তেমনি আধুনিক কালের দার্শনিক আঁরি বের্গ্‌সঁ সে সম্বন্ধে কী বলেন তাহা দেখা যাক। বের্গ্‌সঁ বলেন, চেতনা মানেই স্মৃতি। যে চেতনায় অতীতের কোনো সাক্ষ্য নাই সে চেতনাই নয়— সে তো প্রতিমুহূর্তেই জন্মিতেছে এবং মরিতেছে।

অথচ চেতনার মধ্যে ভবিষ্যতের একটি প্রতীক্ষাও আছে। কিন্তু অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এত গায়ে গায়ে লাগাও যে, তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন ধর আমি যখন বলি 'আমি ভালো আছি' তখন একটু পূর্বেই ভালো ছিলাম এবং পরমুহূর্তেও ভালো থাকিব, এই দুইটা আশ্বাস ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে এমন অব্যবহিতভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে তাহাদের বিযুক্ত করা একপ্রকার অসম্ভব। বের্গ্‌সঁ সেইজন্য বলিয়াছেন যে 'consciousness is a hyphen between past and future'— চেতনা অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটা হাইফেনের মতো। তিনি বলেন, জড়ের সঙ্গে চেতনার প্রভেদ এইখানে যে, চেতনার দ্বারা আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মুহূর্তের মধ্যে, জড়রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যাপার যাহা পরে ঘটিয়াছে তাহাকে ধারণার মধ্যে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই। এই মুহূর্তে আমি চক্ষু দ্বারা যে আলোককে দেখিতেছি তাহার মধ্যে কত সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সংহতভাবে নিহিত হইয়া আছে; কত অর্বুদ অর্বুদ ঈথরের কম্পন-

মালা, যাহা আমি গণনা করিতে গেলে আমার লক্ষ বৎসর লাগিবে। অথচ আমি একমুহূর্তে এতবড়ো কাণ্ডটা অনুভব করিতে পারিতেছি। দৃষ্টির ন্যায় অন্যান্য চেতনা সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। সুতরাং বের্গ্‌সঁর মতে চেতনা মানেই অনেকখানি ব্যাপারকে একটুখানির মধ্যে ধরা, জড়রাজ্যে যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সম্পাদিত হইতেছে তাহাকে একমুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করা। তাহাকে বের্গ্‌সঁ নানা স্থানে কোথাও impulse অর্থাৎ প্রৈতি বলিয়াছেন, কোথাও intuition অর্থাৎ হৃদ্‌স্থিত সহজ ও অখণ্ড বুদ্ধি বলিয়াছেন— অর্থাৎ তাঁহার মতে চেতনা, বিশ্ব-অভিব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিরই প্রেরণা। এইজন্য বের্গ্‌সঁ Creative Evolution গ্রন্থ লিখিয়াছেন— অভিব্যক্তির মধ্যে যে একটি সৃজনীশক্তি চেতনারূপে লীলা করিতেছে ইহাই তিনি প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যোগী। জড় এই সৃষ্টির প্রেরণার উপকরণ মাত্র। কোথাও কোথাও চেতনা জড়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জড়স্বভাবাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার নিয়ত চেষ্টাই এই যে, সে উপকরণের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আপনার অনির্বচনীয় অবন্ধন রূপকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে। এ যেন কবিতা— তাহার প্রাণই আসল, ভাষা তাহার উপকরণ ; যেখানে তাহার প্রাণ পূর্ণ জাগ্রত সেখানে ভাষার দেহ সেই প্রাণে প্রাণিত, যেখানে প্রাণ সুপ্ত সেখানে ভাষাই সব হইয়া উঠিয়া গতিহীন নিশ্চলতা ও মৃত্যুর আকার ধারণ করে।

বের্গ্‌সঁর সম্পূর্ণ মতটি এখানে প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব, কারণ তাহা এক কথায় দু কথায় সারিয়া দিবার মতো নহে। তবে যতটুকু বলা গেল তাহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বের্গ্‌সঁ চেতনাকে যে সৃষ্টির প্রেরণা বলিয়াছেন, জীবনদেবতার আইডিয়ার সঙ্গে তাহার বেশ মিল আছে। সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে এই চেতনার ধারাই তো জীবনে জীবনে আমাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে ; সে কত কী আনিয়াছে, কত সংস্কার

জমাইয়াছে, কত ফেলিয়াছে, কত গড়িয়াছে এবং আজ পর্যন্ত তাহার সেই সৃষ্টির কাজ ক্ষান্ত নাই। সে সমগ্র চেতনাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না লাভ করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াই চলিবে। এক দিকে তাহার অনাদি অতীত, অন্য দিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ।—

এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ,
যা কিছু আছিল মোর?…
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার
চিরপুরাতন মোরে—
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীনজীবনডোরে।

আমি যে জীবনদেবতা লইয়া এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিলাম তাহা দেখিয়া অনেক কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। রসের দিক দিয়া কবিতার একপ্রকার উপভোগ আছে এবং তাহাই যে তাহার শ্রেষ্ঠ উপভোগ সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, কবিতা শুধুই রস কিন্তু সত্য নয়, এমন করিয়া দেখা আমি যথার্থ দেখা বলিয়া মনে করি না। তাহার মাহাত্ম্যই তাহার প্রকাশে, সেইখানেই তাহার রস, এবং তত্ত্বপদার্থ তাহার মধ্যে একেবারেই গৌণ— ইহা স্বীকার করিলেও, তাহাকে সত্তাবর্জিত প্রাণ-বর্জিত রূপমাত্র মনে করিয়া আমি কোনো সান্ত্বনা লাভ করি না। আমার বিশ্বাস এই এবং জীবনদেবতার আলোচনায় এ ক্ষেত্রে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, বড়ো কবি মাত্রেই জানিয়া এবং না জানিয়া তাঁহার কালের সকল দিক্‌কার সকল প্রয়াসের মধ্যে সাধনার মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকেন। আমি যে-সকল

চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলাম, হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন বলিয়া এই জীবনদেবতার ভাব তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছে, কিন্তু তাহা না হইলেও আপনা-আপনি আপনার কবিত্বের অন্তর্দৃষ্টি হইতেই এই ভাব তাঁহাকে অধিকার করিতে বাধ্য— যখন এই ভাবের বাষ্প সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে দেখিতে পাই। এইজন্যই বড়ো কবিকে seer বা দ্রষ্টা বলে— তিনি নদীর মতো তাঁহার কালের নিম্নস্তরে গভীরভাবে প্রবাহিত সকল ভাব-উৎস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যাহা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে তাহাকে তিনি সংহত করিয়া এক করেন। আর এইজন্য বড়ো কবির সমগ্র জীবনের ভিতর হইতে সমুদ্ভূত কোনো আইডিয়াকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র নির্বোধ ও প্রাকৃত জনের দ্বারাই সম্ভব। জীবনদেবতার রহস্য কিছু কিছু উদ্ঘাটিত হইলে তাহা খুবই আনন্দের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।[১]

১৩১৯

১ জীবনদেবতা প্রবন্ধে আমরা জীবতত্ত্বের যে সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছি তাহা পণ্ডিত-সমাজে এখন অগ্রাহ্য। জীবতত্ত্বে লামার্ক্ প্রভৃতির মত ছিল যে, এক আদিম জীবকোষই অভিব্যক্তির ফলে খাদ্য জলবায়ু ও পরিবেষ্টনের (environment) নানা বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন জীবশ্রেণীতে (species) ক্রমে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে লামার্কের 'gelatinous bodies' অথবা হেকেলের (Haeckel) 'moneron', ইহারা কেহই আদিম জীবকোষ নহে। আদিম জীবকোষ এক নহে। গরিলা বা শিম্পাঞ্জি হইতে যে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে বা জীবজন্তু উদ্ভিদ হইতে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, এ মত এখন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা অস্বীকার করিয়াছেন। এখন প্রায় সকলেই বলিতেছেন যে,

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর জীবকোষের মধ্যেই তার স্বাতন্ত্র্য বা বৈষম্যের কারণ বা বীজ সুপ্ত থাকে। কোথাও আমরা ইহা ধরিতে পারি, কোথাও পারি না।

শুধু জীবতত্ত্ব নয়, মনস্তত্ত্বেও (Psychology) ঠিক এই রকম একটা মতের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কণ্ডিল্লাক (Condillac) মনে করিতেন যে আমাদের মনের বিচিত্র ভাব-সকল এক অখণ্ড আদিম চৈতন্য হইতে ক্রমে ধারাবাহিকরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এমন-কি বেইন (Bain) ইহা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বুদ্ধি (intellect) ইচ্ছা (will) প্রভৃতির চিহ্ন গোড়াতেই আমাদের চৈতন্যের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করা যায়। আঁরি বের্গ্‌সঁ তো বলেন যে, বুদ্ধি (intellect) ও বোধি (intuition) চৈতন্যের প্রথম অবস্থা হইতেই বিভিন্ন। ক্রমশ সেই ভিন্নতা স্ফুটতর হয় মাত্র। বোধি হইতে কখনও বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে না বা বুদ্ধি অভ্যাসগত হইয়া কখনও বোধি হইয়া পড়ে না।

ক্রম-উদ্ভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণী (species) ও বিভিন্ন মনোবৃত্তির (faculties) স্বাতন্ত্র্য যদি গোড়াতেই মানিয়া লই, তথাপি জীবনদেবতার মূল কথাটির সহিত তাহার বিশেষ কোনো বিরোধ আমি আশঙ্কা করি না। মানুষের চৈতন্যের বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে এক পরম ঐক্য স্পষ্ট বিদ্যমান, ইহা তো কেহই কোনোরূপে অস্বীকার করিতে পারে না। বৈচিত্র্য যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, ঐক্যও ততই ব্যাপক ও গভীরতর হইয়া সেই-সমস্ত জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যকে এক চরম সমাধানের মধ্যে সার্থক করিবে।

এক অনন্ত বিশ্বচৈতন্যই জড়ে উদ্ভিদে ও জীবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অভিব্যক্তির ফলে মানবাত্মা যতই এই বিশ্বাত্মা বা বিশ্বচৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে ততই তার উপলব্ধির বৈচিত্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-উপলব্ধি যে ক্রমে এই বিশ্ব-ব্যাপকতা লাভ করিয়া ফেক্‌নার-কথিত বিশ্বচৈতন্যের সহিত একটা প্রাণময় যোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় কী? বহুবিধ ব্যক্তিত্বের (multiple personality) বিচিত্র সমাবেশও এই কারণেই তাঁহার একব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া যে প্রকাশমান হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাঁহাকে মানিতেই হয়। সুতরাং জীবনদেবতার এই মূলতত্ত্বটির সঙ্গে বর্তমান জীবতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্তের কোথাও কোনো বিরোধ নাই।

রাজা

বাংলা সাহিত্যে যে-সকল উপন্যাস, ছোটো গল্প, কবিতা ও নাটক পড়া যায় তাহা হইতে বাঙালি পাঠকের মানসিক স্তর নির্ণয় করিবার জন্য কোনো গভীর গবেষণার প্রয়োজনমাত্র করে না। আমাদের 'ডিমাণ্ড্' অনুসারেই এ-সকল জিনিসের 'সাপ্লাই' হয় সত্য ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতদিনকার শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা instinctএর স্তর বেশি দূর পর্যন্ত ছাড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। সেইজন্য আমাদের রুচি যথেষ্ট শুচি হয় নাই, রসবোধ যথেষ্ট গভীর হয় নাই। আমরা যে-সকল স্থূল নিম্নপ্রবৃত্তিময় জীবনের নিতান্ত নিম্নরসের সৃষ্টি করিতেছি তাহাও আবার এমনি ছায়া-ছায়া ভাসা-ভাসা ও দুর্বল যে, মনে হয়, সে-সকল সৃষ্টিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্নায়বিক দৌর্বল্যের ফল বৈ আর কিছুই নয়। তাহাদেরও মধ্যে যদি এই শ্রেণীর ফরাসীস লেখকদের সজীবতা থাকিত তবে কথা ছিল না। কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেই-সকল অপূর্ব সৃষ্টির অন্তর্গত নয়, এ নাটকে যে কতগুলি নিতান্ত স্থূল মানুষের রাগদ্বেষ-প্রণয়াদি হাসিকান্নার ব্যাপারের কৃত্রিম উত্তেজনাপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে না, এ যে একেবারেই সেই পুরানো শ্রেণীর নয়, বরং অত্যন্ত আধুনিক, আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সগোত্র, এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্যই আমি আধুনিক নাটকের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।[১] আধুনিক নাট্যসাহিত্যের মধ্যে 'রাজা' নাটকের স্থান কোথায়, ইহার আর্ট্-রূপের কোনো বিশিষ্টতা আছে কি না, ইহার মধ্যে কোনো নূতন রস সৃষ্ট হইয়াছে কি না, মানবজীবনের কোন্ অংশকে ইহা উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছে, ইহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কোনো নূতনত্ব

১ 'আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

আছে কি না— এই আলোচনাগুলিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আধুনিক নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে একটু মুখবন্ধ করিয়া লওয়া দরকার বোধ করিয়াছি।

'রাজা' অধ্যাত্মরসের নাট্য। এ নাট্যের অনুরূপ কোনো সৃষ্টি সাহিত্যে আছে বলিয়া আমি জানি না। পশ্চিম-মহাদেশে থাকিলেও নাটকাকারে নাই, অন্য আকারে আছে। প্রাচীন কালের সেণ্ট্ অগষ্টিনের Confessions বা দান্তের Vita Nuova এবং এ কালের ব্লেকের The Marriage of Heaven and Hell বা ফ্রান্সিস্ টম্প্সনের The Hound of Heaven— এ সকলের সঙ্গে এ নাট্যের বিষয়ের কতক কতক সাদৃশ্য আছে। তবে সে সাদৃশ্য কোনো কাজেরই নয় এই-জন্য যে, সে-সকল গ্রন্থের অধ্যাত্মরসের সঙ্গে এ রসের প্রভেদ যথেষ্ট। শুধু যে ধর্মভেদের জন্য এই ভেদ ঘটিয়াছে তাহা আমি একেবারেই মনে করি না; কারণ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের মতগত ভেদ যেমনি থাক্, অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য সকল দেশের ধর্মসাধনার মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মভেদের জন্য অধ্যাত্মরসের যে ভেদের কথা বলিতেছি তাহা ঘটে নাই। প্রধান যে কারণে ঘটিয়াছে তাহা বলি।

আর্টের সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার এক জায়গায় গুরুতর রকমের প্রভেদ আছে। শিল্পসাধকের কাছে তাহার নিজের বিশেষ রূপটাই বড়ো; সমস্ত বিশ্বকে সেই রূপের ছাঁচে ঢালাই করিতে পারিলে তবেই তাহার তৃপ্তি। বিশ্ব তার জন্য, সে বিশ্বের জন্য নয়। বিশ্ব তার উপকরণ, সে যেমন খুশি তাহাকে গড়িবে ভাঙিবে। এইজন্যই তাহার কোথাও নিঃশেষে আত্মদান নাই, কেবলই আত্মগ্রহণ আছে। অর্থাৎ সে কেবলই আপনার আধারের মধ্যে বিশ্বকে গ্রহণ করে, বিশ্বকে বিশেষ করিয়া লয়।

অধ্যাত্মসাধকের পথ একেবারে ইহার উল্টা। তাহার কাছে বিশ্বই বড়ো; আপনাকে সেই বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষিত করিতেই তাহার সমস্ত

তৃপ্তি। সে বিশ্বের জন্য, বিশ্ব তার জন্য নয়। বিশ্বরূপের কাছেই তার আত্মদান সম্পূর্ণ হইলে তবেই তাহার সাধনার সম্পূর্ণতা।

তবে সে কালের অধ্যাত্মসাধনার পথ ঠিক এই পথ ছিল, এ কথা বলা যায় না। সে সাধনা প্রধানভাবে বিশ্বের মধ্যে বাড়া ছিল না, বিশ্বকে ছাড়া ছিল। আত্মদান এখনকার মতো তখনও তাহার লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু সে হয় এক অনন্ত অনধিগম্য নিরুপাধি ঈশ্বরের কাছে আত্মদান, নয় এক সান্ত সাকার বিগ্রহের কাছে আত্মদান। সেইজন্যই রূপের সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার ভেদ সে কালে মেলানো শক্ত ছিল। অবশ্য মধ্যযুগে ইউরোপে কিম্বা বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে চীনে এবং জাপানে যেখানে যেখানে শিল্প ধর্মের সেবা করিয়াছে দেখা যায়, সেখানে সেখানে শিল্পসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনা যে মিলিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। বরং সেখানে শিল্প নিজের স্বরূপ খর্ব করিয়া বিশেষভাবে ধর্মশিল্প বা religious art হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং শিল্প ও শিল্পসাধনা বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, সে-সকল যুগের শিল্প ও শিল্পসাধনা একেবারেই তাহা নয়। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই; ধর্মের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যে তাহাদের সীমা বাঁধা। এই কারণেই ধর্মের আধিপত্য ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য আর্টের প্রাণপণ প্রয়াস হয় এবং ক্রমশ ধর্ম আর্ট্‌কে তাহার স্বতন্ত্র পথে যাইতে না দিলে আর্টের রস বিকৃত হইতে থাকে এবং সেই রসবিকার তখন ধর্মের মধ্যেও বিকার ঘটায়। ইতালীর এবং ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের যুগে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। আর্টের সাধনা এবং অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে যে পার্থক্য আছে বলিলাম তাহাকে ভুলিতে গেলেই, কোনো গতিকে দুই সাধনাকে এক করিতে গেলেই, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে কাটে। ৯৯০/বা:

অথচ এ কালে আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই সাধনার মধ্যে যে একান্ত ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহা থাকিলে তো চলে না। এখন তো আর

জীবনকে পায়রার বাসার মতো খোপে খোপে ভাগ করিয়া রাখা সম্ভব নয়। জীবন যে একবস্তু; তাহার মধ্যে এত ভাগ এত ভেদ কেমন করিয়া করা যায়? সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সাধনার ভেদগুলিকে অস্বীকার করিয়া নয়, বরং পুরামাত্রায় মানিয়া লইয়াই দেখিতে হইবে, সে-সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ কোথায়, ঐক্যতত্ত্বটি কোন্‌খানে? সেই ঐক্যতত্ত্বটি যেমনি বাহির হইবে অমনি তাহার রসও আর্টের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিবে।

'রাজা' নাটকের নাট্যবস্তু এই রূপের সাধনা এবং অধ্যাত্মসাধনার ভেদ লইয়া, এবং এই ভেদজনিত সংঘাতের উপরেই এই নাটকের পত্তন। সুতরাং এ নাটকে যে-সকল রস ফুটিয়াছে তাহা একেবারে নূতন। এ-সকল রস যেমন নূতন, যে-সকল চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া এই রসগুলি ফুটিয়াছে তাহাও নূতন। নাটকের প্রধান নায়িকা সুদর্শনা। রূপের সাধনার যে স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তাহাই তাহার চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে। নাটকের প্রধান পাত্র ঠাকুরদাদা। অধ্যাত্মসাধনার যে স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তাহাই সেই চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আর, প্রধান অথচ অদৃশ্য নায়ক স্বয়ং রাজা তাঁহার সম্বন্ধে পরে কথা হইবে।

নাটকের গল্পটি একটি বৌদ্ধজাতক হইতে লওয়া হইয়াছে। মূল গল্পটি নাট্যে ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা এই:

এক কুরূপ বা অরূপ রাজা— মানব হিসাবে ধরিলে কুরূপ, ঈশ্বরের হিসাবে ধরিলে অরূপ— তাঁহার 'সুদর্শনা' রানীকে এক অন্ধকার ঘরে আনাইয়া সেইখানে প্রত্যহ তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহার প্রতি পরমভক্তিমতী তাঁহার এক দাসী ছিল, তাহার নাম সুরঙ্গমা; সে যৌবনে নষ্ট হইবার পথে গিয়াছিল, তার পর রাজার আশ্রয়ে আসিয়া সে রক্ষা পায়, রাজা তাহাকে সেই অন্ধকার ঘরের দাসী করিয়া দেন। রানীর মধ্যে রূপের তৃষ্ণা প্রবল, রাজাকে চক্ষে দেখিতে না পাইয়া রানীর মন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দাসী সুরঙ্গমার মতো অন্ধকার ঘরে রাজাকে ধ্যান

করিয়া তাঁহার তৃপ্তি নাই। রানী শেষে রাজাকে ধরিয়া বসিলেন যে, রাজাকে একবার সব জিনিসের মাঝখানে বাইরে আলোয় দেখা দিতে হইবে। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, বেশ, বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়াইয়া রানী হাজার লোকের মাঝখানে রাজাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। রাজা তাঁহাকে সেই লোকের ভিড়ের মধ্যে সকল দিক হইতেই দেখা দিবেন।

সে দেশের লোকে কিন্তু রাজাকে কখনও চক্ষে দেখিতে পায় না—কারণ, রাজা যেমন রানীর কাছে দেখা দেন না তেমনি প্রজাদের কারও কাছেই দেখা দেন না। তাহাদের অনেকেরই তাই সংশয় যে রাজা মোটেই নাই। বসন্ত-উৎসবে অন্যান্য রাজারা আমন্ত্রিত, রাজার দেখা না পাইয়া তাহাদেরও মনে সেই সংশয়ই পাকা হইয়াছে। কেবল কাঞ্চীর রাজার মনে এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই—লোকটা সংশয়বাদীও নয়—একেবারে নাস্তিক ও বিদ্রোহী বলিলেই হয়।

ইতিমধ্যে বসন্ত-উৎসবে সুবর্ণ নামে এক ছদ্মবেশী এবং সুপুরুষ, এবং সেই কারণেই ভিতরে কাপুরুষ, ব্যক্তি সে দেশের রাজা বলিয়া নিজেকে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কাঞ্চীরাজের কাছে তাহার ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে। কাঞ্চীরাজ আসল রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতই জোর করিয়া অবিশ্বাস করুক, নকল রাজার নকলটুকু তাহার চোখ এড়ায় না। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে লাভ করিবার লোভ রাখে; সুবর্ণকে তাহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সে হাতে রাখিল।

বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে সেই সুরূপ সুবর্ণকে দেখিয়া সুদর্শনা রানী তাহাকেই রাজা বলিয়া ভ্রম করিল। সুরঙ্গমা তাহার কাছে ছিল না। রানী পদ্মপাতায় ফুল সাজাইয়া সুবর্ণকে রাজা-ভ্রমে অর্ঘ্য পাঠাইল। সুবর্ণ তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু কাঞ্চীরাজ বুঝিতে পারিয়া সুবর্ণের গলা হইতে মুক্তার একগাছি মালা নিজে খুলিয়া লইল এবং দাসীর

হাত দিয়া মহারাজের মালা বলিয়া রানীকে পাঠাইয়া দিল। রাজার হাতের এই অগৌরব রানীকে বিঁধিল।

তার পরে অদৃশ্য রাজার প্রতি অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে পাইবার আশায় প্রাসাদের এক কোণে আগুন ধরাইয়া দিতে, সে আগুন দেখিতে দেখিতে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, কাঞ্চী নিজে পলাইবার পথ পায় না। বেচারা সুবর্ণ তখন ভয়ে আকুল, রানী আগুন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার শরণাপন্ন হইতেই সে তৎক্ষণাৎ কবুল করিল যে, সে রাজা নয়। লজ্জায় সুদর্শনা ম্রিয়মাণ হইল। তার পরে সেই প্রলয়ের দিনে আসল রাজার প্রচণ্ড ভয়ানক রূপ সে দেখিতে পাইল—ধূমকেতু-উঠা আকাশের মতো কালো রূপ। রাজা সেই রুদ্র ভীষণ রূপেই রানীকে প্রবৃত্তির প্রলয়দাহ হইতে রক্ষা করিলেন। তখন রানীর ভিতরে এক দিকে পাপের নিদারুণ দাহ ও লজ্জা, অন্য দিকে রূপের তীব্র নেশা। রাজার সেই ভীষণ রূপ সে সহ্য করিতে পারিল না। রাজার কাছ হইতে সে দূরে পলাইয়া যাইতে চাহিল।

সুদর্শনা রাজার কাছে থাকিল না। রাজা তাহাকে কোনো নিষেধ করিলেন না, তাহার উপর জোর করিলেন না। সুদর্শনার মনে তীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল। তাহার সেই বিদ্রোহের দিনে সুরঙ্গমা তাহার সঙ্গ লইল। সে বলিল, 'তোমার পাপের আমিও ভাগী। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।'

স্বাভিমানের সঙ্গ লইল নম্রতা।

সুদর্শনা তখন তাহার বাপের বাড়ি আসিল। রাজার সম্বন্ধে তাহার তখন তীব্র অভিমান ; কারণ, বাপের বাড়িতে তাহার তো আর রানীর ঐশ্বর্য নাই, সেখানে তাহার অগৌরবের স্থান, সেখানে তাহাকে দাসী হইয়া থাকিতে হইতেছে। তাহার যে পতন হইয়াছে এবং সেইজন্য যে তাহার অহংকার পদে পদে ক্ষুন্ন হইতেছে, সে কথা বুঝিলেও মানিয়া লওয়া তাহার

পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। রূপলালসা তখনও তাহার মন হইতে সরে নাই ; সুবর্ণ তখনও তাহার কাঙ্ক্ষিত, যদিচ তাহার ভীরুতার জন্য তাহার প্রতি সুদর্শনার ধিক্কার জন্মিয়াছে। পাপের বিদ্রোহের ভিতর একটা সাহস আছে, একটা উত্তেজনা আছে ; সে উত্তেজনা প্রলয় ঘটাইবার উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার ভিতর তীব্র আনন্দ। শেক্‌স্‌পীয়রের 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড্ ক্লিয়োপেট্রা'র মধ্যে সেই প্রলয়ের তীব্র উত্তেজনার আনন্দের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুদর্শনার বিদ্রোহের মধ্যে সেই সাহস, সেই উন্মাদনা প্রচুর ও প্রবল রূপে জাগিয়াছে, কিন্তু যাহার জন্য সে সমস্ত ছাড়িল সে কোথায় ? সে এমন ভীরু ? সুদর্শনাকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার সাহস তাহার নাই ?

ইতিমধ্যে কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে বাহন করিয়া সুদর্শনাকে লইবার জন্য তাহার পিতার রাজ্যে উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে কাঞ্চী ছাড়া আরও কয়েকজন রাজা আসিল। সেই সাত রাজার সঙ্গে তখন সুদর্শনার পিতার যুদ্ধ বাধিল এবং তিনি বন্দী হইলেন। সুদর্শনার জন্য স্বয়ম্বরসভা প্রস্তুত হইল। সেই সভায় কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে ছত্রধর করিয়া সিদ্ধিলাভের আশা করিল। রাজসভায় সুবর্ণকে দূর হইতে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার প্রতি সুদর্শনার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল, সুবর্ণ কিছুমাত্র সুন্দর নয়। সে স্থির করিল যে, এই সাত রিপুর সাত রাজার টানাটানির আয়োজনের মাঝখানে সেই স্বয়ম্বরসভায় বুকে ছুরি বসাইয়া সে আত্মঘাতিনী হইবে।

এইখানেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ। তাহার অর্ঘ্য যে সৌন্দর্যের অন্তরতর রিক্ত নির্মল 'সবরূপ-ডোবানো রূপ'এর কাছে না পৌঁছিয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের ভোগলালসাপ্রদীপ্ত স্থূল রূপের মলিনতার মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ধুলায় লুটাইয়াছে, যে মুহূর্তে সে ইহা অনুভব করিতে পারিল সেই মুহূর্ত হইতেই তো তাহার প্রায়শ্চিত্তের

শুরু, এবং মুক্তিরও সূত্রপাত। সৌন্দর্যবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন তো পাপ নয়; পাপ, যখন লালসা সৌন্দর্যবৃত্তির স্থান জুড়িয়া বসে। সে লালসা নিতান্ত ইন্দ্রিয়ের জিনিস— হৃদয়কে তাহা নষ্ট করিতে পারে না।

তার পর স্বয়ম্বরসভায় হঠাৎ রাজাদের আসন কাঁপিয়া উঠিল এবং যোদ্ধবেশে ঠাকুরদাদা প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্বে কাঞ্চীরাজ প্রভৃতি বসন্ত-উৎসবে ঠাকুরদাদাকে কতকগুলি দলবল লইয়া নাচিতে গায়িতে দেখিয়াছে। এখন ঠাকুরদা যখন বলিলেন, রাজা আসিয়াছেন এবং তাঁহার সেনাপতি তিনিই, তখন কাঞ্চীরাজ সে কথায় ভুলিল না। আর-সকল রাজাই ভয়ে তখনি হার মানিল। কেবল কাঞ্চীরাজ শেষ পর্যন্ত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে বিদ্রোহী, সে পুরাপুরি অবিশ্বাসী।

সুদর্শনার অভিমান তখনও যায় নাই। কেবল মনটা ভিতরে গলিয়াছে, পাপের মলা বেদনার অশ্রুজলে ধুইয়াছে। তাহার বিশ্বাস রাজা তাহাকে নিশ্চয় ডাকিয়া লইবেন। সে ঠাকুরদার মুখে শুনিল, রাজা যুদ্ধ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাকে তিনি উদ্ধার করিলেন, কিন্তু ডাকিয়া লইলেন না।

তার পর শেষ দৃশ্যে পরাজিত কাঞ্চীরাজ, ঠাকুরদাদা, রানী, সুরঙ্গমা সকলেই পথে বাহির হইল। সে পথ যাত্রীর পথ, মুক্তির পথ, বিশ্বের পথ। সকল অভিমান ভাসাইয়া দিয়া সেই পথে রানী বাহির হইতেই রাজাকে যেন সেই পথেই পাইল। তখন তাহার দীনবেশ, তাহার রথ নাই, তাহার কোনো সমারোহ নাই। শেষে রাজার সঙ্গে দেখা মিলিতে রানী বলিল, 'আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।' তাহার আত্মদান এতদিনে সম্পূর্ণ হইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে সইতে পারবে?'

রানী বলিল, 'পারব।··· প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম— সেখানে

তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে— তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।'

রাজা বলিলেন, 'তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।'

সুদর্শনা বলিল, 'যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে; সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও— সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।'

তখন রাজা তাহাকে বলিলেন, 'অন্ধকারের লীলা এবার শেষ হল। এখন বাইরে চলে এসো, আলোয়।'

নাটকের এইখানে সমাপ্তি।

আমি বলিয়াছি, রূপের সাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার দ্বন্দ্বের উপরেই এই নাটকের ভিত্তি। সুদর্শনার ভিতর দিয়াই সেই দ্বন্দ্বের লীলা এ নাটকে আমরা দেখিতেছি। তাহার রূপের জন্য প্রবল তৃষ্ণা। প্রথম অবস্থায় সেই তৃষ্ণা তাহাকে অশুচি অসতী করিল,তাহার প্রমোদ-উদ্যানে আগুন লাগাইয়া দিল, তাহাকে প্রতিষ্ঠাচ্যুত করিয়া সাত রিপুর টানাটানি-হানাহানির মাঝখানে ফেলিয়া দিল, তাহার ভিতরে প্রবল আত্মাভিমান জাগাইল। দ্বিতীয় অবস্থায় অপমান এবং আঘাতের ভিতর দিয়া বাহ্য-রূপের কামনা ক্রমে ক্রমে মরিয়া গিয়া 'সবরূপ-ডোবানো রূপ', অপরূপ রূপ, রানীর মনটিকে ক্রমশ অধিকার করিয়া তাহাকে মধুর করিল এবং পরিপূর্ণ আত্মদানে যখন তাহার আত্মাভিমানও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইল তখনই রাজার সঙ্গে তাহার যথার্থ মিলন ঘটিল। সুদর্শনার পরিণতির ক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। আদিতে,সৌন্দর্য-উপভোগের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা; মধ্যে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া নৈতিক অবনতি,লালসার অগ্নিকাণ্ড,প্রবৃত্তির বিদ্রোহ; শেষে, দ্বন্দ্বাবসানে মাধুর্যে আত্মদান এবং আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি,ঐশ্বর্যের বদলে দৈন্যকে স্বীকার

এবং নিখিল জগতের মধ্যে সেবার অধিকার-লাভ। সৌন্দর্য হইতে ধর্মনীতিতে এবং ধর্মনীতি হইতে আধ্যাত্মিকতায় এই-যে উত্তরণ, ইহা এমন ধাপে ধাপে না ঘটিলে আত্মার পক্ষে অন্ধকার হইতে আলোকে আসা কোনোমতেই সম্ভাবনীয় ছিল না। সুদর্শনার ইতিহাস আত্মার এই অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস এবং এই অভিনব soul dramaর প্রধান নাট্যবস্তু।

কিন্তু এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে, যদি রাজার স্বরূপটি কী তাহা না দেখি। সে রাজা কি বেদান্তের অনন্ত অনধিগম্য নিরুপাধি ব্রহ্ম না বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ ভগবান ? এ নাট্যে রাজার স্বরূপ কী তাহা না জানিলে রানীর এই আত্মার ইতিহাসের কোনো মূল্যই থাকে না।

একমাত্র লোক যিনি রাজাকে চেনেন তিনি ঠাকুরদাদা। সুতরাং তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে রাজার স্বরূপের কোনো কোনো লক্ষণ ধরা পড়িতে বাধ্য।

একেবারে প্রথম দৃশ্যে যখন রাজার এই নূতন রাজ্যে পথিকের দল উপস্থিত তখন তাহারা প্রহরীকে উৎসবে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে। প্রহরী উত্তর করে, 'এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে।' এ খোলা রাস্তার দেশ, এ 'Open Road', এখানে কোনো মানা বা নিষেধ নাই। রাজাকে কেউ দেখে না, তাই কেউ ভয়ও করে না। রাজা কেন দেখা দেন না তার উত্তরে ঠাকুরদাদা বলিতেছেন, 'সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।'—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে!

রাজা সবাইকে বিধিনিষেধহীন খোলা রাস্তায় বাহির করিয়া রাজা করিয়া দিয়াছেন, এ তো স্পষ্টই এখনকার ডেমোক্র্যাটিক ঈশ্বরের কথা। ডেমোক্র্যাটিক বা গণেশ-ভগবানের ধারণা আমাদের দেশে যে নাই তাহা নয়। তাঁহাকে নরনারায়ণরূপে দেখিবার সাধনা, জীবে জীবে তিনি শিব-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন এ ভাবে দেখিবার সাধনা, তাঁহাকে বিশ্বরূপ করিয়া দেখিবার সাধনা, আমাদের দেশের কোনো কোনো সাধকশ্রেণীর মধ্যে ছিল এবং এখনও আছে। যে যে-পথে যায় সে যে তাঁহারই পথে চলিয়াছে, সকলেরই পথ যে তাঁহার পথ— এ কথাও আমাদের দেশের ধর্মসাধনার মুখ্য কথা। তবু মনে হয় যে, ডেমোক্র্যাসি জিনিসটা পশ্চিমের জিনিস বলিয়া ডেমোক্র্যাটিক ভগবানের ধারণা পশ্চিমে যেমন করিয়া জাগিয়াছে এমন করিয়া আমাদের দেশে কখনও জাগিয়াছিল কি না সন্দেহ। সাবেক কালে যখন ব্যক্তিদের তাল পাকাইয়া এক-একটা class বা জাতি তৈরি করা হইত, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কোনো কথাই ছিল না। তখন এ তত্ত্ব কেহ বুঝে নাই যে, মানবসমাজের চালক মানবসমাজ নিজেই— কোনো রাজাও নয়, কোনো জাতিতন্ত্রও নয়। সমাজের সকল সামাজিকের পরস্পরের সীমাসংখ্যাহীন অদৃশ্য ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ জিনিসটা ক্রমশ একটা অখণ্ড বস্তু হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এই সমাজ আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মক্রিয়াবান্‌, আত্ম-অগ্রসরশীল। অথচ এই সমাজ কেবল মানুষেরই নয়, ইহা অসংখ্য জীবের আছে। এই নিখিল বিশ্বসমাজের (cosmic society) পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবানের স্বরূপ। সেই নিখিল বিশ্বসমাজের অভিব্যক্তি যেমন শেষ হয় নাই তেমনি সেই সমাজের চিদ্‌রূপী যে ভগবান তাঁহারও শেষ হইতে পারে না। তিনি সেই ক্রমবিকাশশীল নিখিল বিশ্বসমাজের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছেন, নিখিল বিশ্বসমাজের সঙ্গে সঙ্গে নানা ভোগ ভুগিতেছেন, এবং নিখিল বিশ্বসমাজের সমস্ত বাধাকে জয় করিয়া ক্রমাগতই চলিতেছেন। ইহা

এ কালের ডেমোক্র্যাটিক বা গণেশ-ভগবানের ধারণা। আমাদের দেশে যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান যে যুগে যুগে ক্রমাগতই অবতীর্ণ হইতেছেন, এই ভাবের সঙ্গে পশ্চিমের এই অভিনব ডেমোক্র্যাটিক ভগবানের ভাবের বেশ মিল আছে। দুইই এক বস্তু। 'Democracy : a New Unfolding of Human Power' গ্রন্থে অধ্যাপক য়ুড্স্ বলিতেছেন—

This new spirit, forming itself, as it were, upon the restless sea of humanity, will, without doubt, determine the future sense of God and destiny... Society, as a federal union, in which each individual and every form of human association shall find free and full scope for a more abundant life, will be the large figure from which is projected the conception of God in whom we live and move and have our being.

রবীন্দ্রনাথের রাজা এক দিকে সকলকে রাজা করিয়া দিয়া সমস্ত মানুষকে বিধিনিষেধহীন খোলা রাস্তার দেশে বাহির করিয়া দিয়াছেন, তিনি এই ডেমোক্র্যাটিক ভগবান। অন্য দিকে তিনি রানীর বা আত্মার একমাত্র স্বামী, একমাত্র প্রণয়ী। আত্মা তাঁহার 'দ্বিতীয়', আত্মা তাঁহার 'উপমা', আত্মা তাঁহারই 'সুদর্শনা' রূপ। তাই ঠাকুরদা ও তাঁহার দলের ভিতর দিয়া এই রাজার স্বরূপের এক পরিচয়, সুদর্শনা রানীর ভিতর দিয়া এই রাজার স্বরূপের অন্য পরিচয়। এই দুই পরিচয়ই সমান সত্য ও মূল্যবান। তিনি বিশ্বরূপ অথচ তিনি বিশেষরূপ। তিনি সমস্ত অথচ তিনি একক। রবীন্দ্রনাথের রাজার মধ্যে এই দুই স্বরূপের মিলন যেন বাস্তবিক পক্ষে পূর্বে এবং পশ্চিমে রাজার দুই ভিন্ন রকমের স্বরূপবোধের মিলন।

এইজন্য এই নাট্যে ঠাকুরদার প্রয়োজন আছে রানীকে; রানীর প্রয়োজন আছে ঠাকুরদাকে। ঠাকুরদা যতদিন রানীর ভিতর দিয়া রাজাকে দেখেন নাই ততদিন রাজাকে পুরা করিয়া, সমগ্র করিয়া দেখিতে

পারেন নাই। আবার রানী রাজার অন্য স্বরূপ কোনোদিনই বুঝিতেন না, যদি রানীকেও পথে বাহির হইতে না হইত। এইরূপে অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজন ছিল রূপের সাধনাকে ; রূপের সাধনার প্রয়োজন ছিল অধ্যাত্ম-সাধনাকে। যে ঠাকুরদাদা বিশ্বের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন তিনি জানেন নাই যে, ত্যাগের শেষেও একটি ভোগ আসে, একবার আপনার আধারে বিশ্বকে নিবিড় করিয়া পাওয়া দরকার। সেই আধার রূপের আধার। পক্ষান্তরে, যে রানী বিশ্বকে কেবলই বিশেষ রূপ দিয়া সেই আধারেই ভোগ করিয়াছে সে জানে নাই যে, সর্বস্বত্যাগ ভিন্ন ভোগের পূর্ণতা নাই, আপনাকে বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষে বিলাইয়া চুকাইয়া দিলে তবেই ভোগের পূর্ণতা।

কেবল রাজার স্বরূপের মধ্যে একটি দিক পাই না। এ রাজা দুঃখময় ভগবান নন, suffering God নন। জীবাত্মা রানীর মুখ দিয়া রাজাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আমাকে কেমন ক'রে দেখতে পাও? কী দেখ?' রাজা উত্তর করিতেছেন যে, তিনি মানুষকে বিশ্ব-অভিব্যক্তির চরমতম পূর্ণতম রূপ করিয়া দেখিতেছেন। কী আশ্চর্য, কী চমৎকার সেই জায়গাটি! রাজা বলিতেছেন, 'দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।' মানুষের এই সীমাবদ্ধ এতটুকখানি রূপের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের রূপ, সমস্ত চন্দ্রসূর্যতারার রূপ যে ভরিয়া আছে এবং অরূপ ভগবান যে সেই রূপে মুগ্ধ, এমন কথা এমন আশ্চর্য ভাষায় পৃথিবীর আর কোন্ মহাকবি বলিয়াছেন আমি জানি না।

অথচ দেখি, সেই রাজা সুদর্শনার পতনের পর একেবারে নিশ্চল, নির্বিকল্প, নির্বিকার। যে সুদর্শনা তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার দ্বিতীয়, সে তো দূর নয়, সে তো অন্য নয়। তাহার পাপভোগে কি তাঁহার কোনো ভোগ

নাই, তাঁহার কোনো যন্ত্রণা নাই ? রবীন্দ্রনাথের রাজা তো স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত সুদূর ভগবান নন। অবশ্য রাজা সে সময়ে গোপনে সুদর্শনার বাতায়নের নীচে প্রেমের বীণা বাজাইয়া সুদর্শনার ভিতর হইতে তাহার মন গলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং সাত রিপু বা সাত রাজার টানাটানির অপমান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু জীবের মুক্তির জন্য কোথায় তাঁহার বেদনা, তাঁহার ব্যাকুলতা ?

আমার মনে হয়, এক পক্ষে রাজার প্রেম এমনি নির্বিকার নিরুদ্‌বিগ্ন প্রেম বলিয়া অন্য পক্ষে সুদর্শনার প্রেমও প্রথম অবস্থায় প্রবৃত্তির অপেক্ষাকৃত নীচের স্তর ছাড়াইয়া খুব বেশি উঁচুতে উঠিতে পারে নাই। অভিমানের আগুনে যখন গলিল তখনও কোথায় সুদর্শনার প্রেমের গভীর শান্তি, রহস্যগম্ভীরতা, নিবিড় পরিপূর্ণতা, আত্মবিহ্বল রসপ্লাবন ? নাটকের শেষের ভাগে এগুলির আভাস আছে বটে, কিন্তু আরও একটু পূর্ণতর স্ফুটতর প্রকাশ হইলে সুদর্শনার অধ্যাত্মপ্রেমের মাধুর্যপরিপ্লুত ভক্তিবিনম্র রূপটি আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত।

সুদর্শনার পাশাপাশি রাজার দাসী সুরঙ্গমার চিত্রটি কী আশ্চর্য ! ঠিক একটি ভক্ত সাধকের চিত্র। তাহার চরিত্রে কোনো জটিলতা নাই। একসময়ে সে পাপের পথে গিয়া ঘা খাইয়া ধর্মের পথে ফিরিয়াছে, তার পর ঐকান্তিক নিষ্ঠাতেই তাহার সমস্ত চরিত্র স্থিতি পাইয়াছে। সে বলিতেছে, রাজার 'কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা !' অথচ বলিতেছে, 'এত অটল এত কঠোর ব'লেই এত নির্ভর, এত ভরসা।' ক্রমে সেই নিষ্ঠার ভিতর দিয়া সে এক সময়ে অন্ধকার ছাড়িয়া আলোতেই আসিল। অর্থাৎ, আপনার ভিতরকার সাধনার নিভৃত বেষ্টনটি ছাড়াইয়া সমস্ত সংসারের ভিড়ের মধ্যেই আসিল। সুদর্শনা যখন রাজার উপর রাগ করিয়া দূরে চলিল তখন সে বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।' সুদর্শনা তাহাকে বলিল, 'না, তোকে আমি নিতে পারব না— তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি

হবে— সে আমি সইতে পারব না।' সুরঙ্গমা বলিল, 'মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি।'—

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী,
আমি সকল দাগে হব দাগী।

সুরঙ্গমা এইখানেই তাহার ভক্তিসাধনার চরম অবস্থায় গিয়া পৌঁছিল। এতদিন সে অন্ধকার ঘরের দাসী ছিল, সে আপনার ভিতরকার সাধনার নিষ্ঠার মধ্যেই স্থির হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। এখন সে সংসারে আসিয়া সকলের কলঙ্কভাগী, সকলের পাপের দাহের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কারণ, তাহা না হইলে পাপ তো যায় না। পাপ যায় পাপের ভার গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ পাপ যায় প্রেমে— কারণ, প্রেমেই ভার লয়, ভার বয়। তাই সুরঙ্গমা গাহিতেছে—

আমি শুচি-আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারই ছাপ বক্ষে মাগি।

মানুষের পাপ সম্বন্ধে ঈশ্বরেরও তো ঠিক এই ভাব। নহিলে তাঁহারও প্রেমের মূল্য কী? সুরঙ্গমার এই প্রেম, এই অচল নিষ্ঠাই সুদর্শনাকে ভিতরে ভিতরে গলাইয়াছে। অবশ্য, সুদর্শনার পরিবর্তন তাহার মতো এমন সহজে ঘটিবারই নয়। কারণ, তাহার অভিমানের আয়োজন অত্যন্ত বিচিত্র, তাহার পক্ষে অভিমান ত্যাগ বড়ো কঠিন, তাই তাহার আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটানোও কঠিন; সে যে অন্ধকারকেই চায় না, অর্থাৎ সে সাধকদের মতো অপরূপকে শুধু অন্তরের ধ্যানলোকের মধ্যে দেখিতে চায় না। সুরঙ্গমা বলে, 'আমার মনে হয়, যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।... আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।' সুদর্শনা ঠিক তার উল্টা কথা বলে, 'যেখানে আমি গাছপালা

পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।'

সুদর্শনার মতো বিদ্রোহী কাঞ্চীর রাজা; যদিচ তাঁহার টাইপ স্বতন্ত্র। রাজাদের মধ্যে তাঁহারও পরিবর্তন ঘটানো তুলা কঠিন। কারণ, আর সবাই মূঢ় সংস্কারের বশবর্তী— তাহারা রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও যেমনি শোনে যে রাজা আসিয়াছেন অমনি মাথা নিচু করে। কিন্তু কাঞ্চী শেষ পর্যন্ত অটল। এই বিদ্রোহ, আত্মশক্তির উপর ষোলো-আনা নির্ভরের জন্য বিদ্রোহ। সুতরাং এ বিদ্রোহ প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙে। শেষ দৃশ্যে যখন সকলেই 'Pilgrim's Progress'এর মতো রাজার দর্শন-লাভের জন্য পথে চলিয়াছে তখন কাঞ্চী বলিতেছে, 'যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি— তার আর দেখাই নেই।'

কাঞ্চীরাজার বিদ্রোহ সুদর্শনার চেয়ে ঢের জোরালো। সে রাজার রানীকেই জোর করিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং সেজন্য কত কলকৌশলের অবতারণা করিয়াছে। সে ঈশ্বরকে চায় নাই, ঐশ্বর্যকে চাহিয়াছে। সে ঐশ্বর্যের প্রভু হইয়া ঈশ্বরের জায়গায় নিজেকে বসাইতে চাহিয়াছে। এ বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত লড়ে, তার পরে মরে।

এইবার ঠাকুরদার কথা এবং তাঁর দলের কথা বলিয়া এ নাটকের কথা শেষ করিব। গ্রীক নাটকে কোরাসের যে কাজ ছিল, ঠাকুরদা ও তাঁহার দলের ঠিক সেই কাজ এ নাটকে দেখিতে পাই। এ নাটকে লিরিক-অংশের সন্নিবেশ ঐখানে।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ লিরিক কবি বলিয়া তাঁহার নাটকের মধ্যে, গল্পের মধ্যে, এমন-কি উপন্যাসের মধ্যেও মূল প্লটের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছায়া-প্লট সর্বদাই গাঁথা থাকে— ড্রামার সঙ্গে সঙ্গে একটা গীত-অংশ দেখিতে

পাওয়া যায়। রাজা-নাট্যে বসন্ত-উৎসবের অবতারণা এবং ঠাকুরদার দলের অবতারণা এ নাটকের সেই লিরিক-ভাগ এবং বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

গ্রীক কোরাসের আসল অর্থ ছিল নৃত্য কিম্বা নৃত্যের রঙ্গমঞ্চ। গ্রীক দেবতাদের উৎসবে নৃত্য একটা বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান ছিল। এই নৃত্য হইতেই ক্রমে গ্রীক নাট্যের উৎপত্তি। গোড়ায় নৃত্যে কোনো কথা ছিল না, ক্রমে নাট্যের উৎপত্তি হইতে কোরাসের মুখে কথা জোগাইল। এই কোরাস গ্রীক নাট্যে একটা বিশেষ লিরিক-রস সঞ্চার করিয়াছিল।

গ্রীক ড্রামা হইতে এই কোরাসের ভাব লইয়া যে রবীন্দ্রনাথ রাজা নাট্যে ঠাকুরদার দলটিকে আনিয়াছেন তাহা বলি না। ইহা নাটকের একটি গভীরতর প্রয়োজন হইতে আসিয়াছে। গিল্‌বার্ট্‌ মারে গ্রীক কোরাসের যে প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন তাহাও এখানে কতকটা খাটে। তিনি বলিয়াছেন :

It (chorus) will translate the particular act into something universal.

কোরাস একটা বিশিষ্ট ঘটনাকে বিশ্বব্যাপক করিয়া তাহার রূপ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো প্রয়োজন এই যে, সকল নাট্যদৃশ্যের পিছনে একটি অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে— সে দ্রষ্টা, সে সাক্ষী। নাট্যের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যে চরম পরিণাম বা climaxটি তৈরি হইয়া উঠিতেছে, সে তাহার সবটাই যেন জানে। তাহার কাছে যেন রঙ্গমঞ্চের সকল দৃশ্য, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ, নেপথ্য পর্যন্ত অনাবৃত। নাটকের সেই বিচিত্র রসকে সে আপনার অখণ্ড দৃষ্টির দ্বারা এক-রস করিয়া লয়। মধ্যে মধ্যে তাই এই কোরাস আসাতে সেই অখণ্ড রসটি, অখণ্ড সুরটি, সকল বিচিত্রতার ভিতরে ভিতরে জাগিতে থাকে বলিয়া নাটক জিনিসটা নাটক থাকিয়াও একটি

লিরিকের সম্পূর্ণতা লাভ করে।

ঠাকুরদা একটি মুক্ত আত্মা, সর্বদাই আনন্দিত। সকলের মধ্যে তাঁহার প্রবেশ অত্যন্ত স্বচ্ছ, অবাধ এবং সহজ, কারণ বিশ্বের কাছে তাঁহার আত্মদান একেবারে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।—

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে—
তাতা-থৈথৈ তাতা-থৈথৈ তাতা-থৈথৈ।
কী আনন্দ. কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ।
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে—
তাতা-থৈথৈ তাতা-থৈথৈ তাতা-থৈথৈ।

বসন্তোৎসবে এই তাঁর নাচের গান। রাজা নাটকে এই কোরাসের গান।

অথচ, ঠাকুরদা বসন্তোৎসবে আনন্দ করিতেছেন বলিয়া দুঃখের কথা মোটেই বিস্মৃত নন। তাঁহাকে যখন কেহ আসিয়া ছেলের মৃত্যু-সংবাদ দিতেছে এবং রাজাকে সেইজন্য অবিশ্বাস করিতেছে তিনি তখন উত্তর দিলেন, 'ছেলে তো গেলই, তাই বলে ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব?'

সে ব্যক্তি বলিল, 'ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!'

ঠাকুরদাদা বলিলেন, 'ঠিক বলেছিস ভাই! তা, সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর্। ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।' তার পর গাহিতেছেন—

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে?

যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দ্যাখ্‌ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন-কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে—
অবোধজনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

এ গানের চেয়ে 'ঝরা ফুলের মেলা' এবং 'লক্ষ মাটির ঢেলা' পৃথিবীর ব্যর্থকাম অবোধজনদের সান্ত্বনার গান কি দুনিয়ায় আর কাহারও দ্বারা কোথাও রচিত হইয়াছে? এতবড়ো ভরসার কথা, পশ্চিমে ডেমোক্র্যাসির জয়গান যিনি করিয়াছেন সেই মহাকবি ওয়াল্ট্‌ হুইট্‌ম্যানের একটি কবিতার মধ্যেও নাই।

এখনকার কালের সভ্যতার বসন্ত-উৎসব যে এই 'লক্ষ মাটির ঢেলা' জনগণকে লইয়া। এই-যে সবাই চলিয়াছে খোলা রাস্তার দেশে পা ফেলিয়া ফেলিয়া। এ কালের ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের ভাগ্যবিধাতা তো কোনো একজন মানুষও নয়, কোনো একদল মানুষও নয়। এই কারণে সকলেরই মনে কত সংশয় হয়, কত ভয় হয়। মনে হয়, 'সবাই রাজা' ভালো, না 'এক রাজা' ভালো? অথচ বিজ্ঞ অবিজ্ঞ, সুনীতিপরায়ণ দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর পরার্থপর, দেশহিতৈষী দেশবিদ্রোহী, ভালো মন্দ মাঝারি, বাল বৃদ্ধ, নর নারী— এই সমস্ত স্তূপ মিলিত হইয়াই আজ তাঁহা 'মানবভাগ্যবিধাতা' হইয়াছে। এই স্তূপের ভিতরেই ভগবান, এই স্তূপ

ভগবানের ভিতরে। ইহার মধ্যে কাহাকে বাদ দিবে, কাহাকেই বা অবজ্ঞা করিবে ? বিবেকানন্দের ভাষায়, এ সমস্তই যে ব্রহ্ম, এ সবই যে নারায়ণ।

ঠাকুরদা তাই গাহিতেছেন, ভয় নাই, ভাবনা নাই—

কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ।

ঠাকুরদার এই কোরাসের সুর আগাগোড়া সমস্ত নাটকটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত। শেষ পর্যন্ত এই সুর।

আমি বলিয়াছি যে ঠাকুরদাদার প্রয়োজন ছিল সুদর্শনাকে, সুদর্শনার প্রয়োজন ছিল ঠাকুরদাদাকে।

সুদর্শনার পাপের মূলই তাহার আত্মাভিমানে। তাহার কাছে তাহার নিজের রূপটাই ছিল বড়ো, সে বিশ্বকে সেই রূপের ছাঁচে ঢালাই করিতে চাহিয়াছিল। সকল আর্টিস্ট্-প্রকৃতিই তাই চায়। সে তো রাজার কাছে কোনোদিনই আপনাকে নিঃশেষে দান করে নাই ; সে রাজাকেও আপনার রূপ দিয়া কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহাকে আপনার বিশেষ ভোগের সামগ্রী করিতে চাহিয়াছিল। আত্মাভিমানেই আত্মাভিমানের ক্ষয়। তাহার প্রবৃত্তির, তাহার ভোগলালসার, আগুন জ্বালাইয়া সে যখন রাজাকে দেখিল, দেখিল তিনি 'ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো— তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা'। তখন সে যে 'ননীর মতো কোমল— শিরীষফুলের মতো সুকুমার— প্রজাপতির মতো সুন্দর' সৌন্দর্যলোকটি, কল্পলোকটি তৈরি করিয়াছিল, তাহা টেনিসনের Palace of Art'এর মতো এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সৌন্দর্যের মধ্যে এতদিন সে শুধু দেখিয়াছিল মনোহর অংশটুকু, এখন সৌন্দর্যের অন্তরতর প্রচণ্ড রুদ্র অংশকেও সে দেখিতে পাইল।

এই আত্মাভিমানটি জীবের কাছে ভগবানের সকলের চেয়ে বড়ো প্রার্থনার জিনিস। এইটিই পাত্র, যে পাত্রে তিনি অমৃত পান করেন ;

এইটিই দর্পণ, যে দর্পণে তিনি আপনার রূপ আপনি দেখেন। ঠাকুরদাদার এইটিই ছিল না, সেইজন্য সুদর্শনাকে দেখিবার আগে বসন্ত-উৎসবে হোলির মাতামাতির রাতে তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁর মন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল—

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে,
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে?

তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে—

কাটিল ক্লান্ত বসন্তনিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী-সনে।

কিন্তু—

উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে?
কে লয়ে যাবে সে ভবনে—
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে?

সকল ত্যাগের শেষে যে একটি ভোগ আছে, নিজের আধারটি প্রস্তুত না থাকিলে সে ভোগ তো পূর্ণ হয় না। ঠাকুরদাকেও তাই শেষকালে পথে বাহির হইতে হইল, দলবল সব পিছনে পড়িয়া রহিল। সুদর্শনাকেও পথে বাহির হইতে হইল, কিন্তু সে পথে আরও সহযাত্রীর দল সঙ্গে চলিয়াছে। দুজনের দুরকমের মুক্তি।

১৩২৩

ডাকঘর

'We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift. Some are born near it, as it were, and pass their lives striving to peer through its web, catching now and again visions of inexplicable things ; but some of us live so far from the veil that we not only deny its existence but delight in mocking those who perceive what we cannot.'

—Laurence Alma Tadema

উপরের কয়েকটি ছত্র পাঠ করিয়া সমালোচনা লিখিতে আর ভরসা হয় না, কারণ veil-এর কাছাকাছি আছি এমন কথা তো বলিতে সাহস হয় না, অবগুণ্ঠনের ভিতরকার কথা তো কিছুই জানি না। তবে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের পরিহাস করিতে আনন্দ পাই, এতবড়ো বর্বরতার অপবাদ ঘাড়ে করিতে রাজী নই।

যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাঁহারা ফুলকে ছিঁড়িয়া তাহার অংশ-প্রত্যংশের কোন্‌টার কী কাজ তাহা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু সাহিত্যের বাগানে যে ভাবের ফুলটি ফোটে তাহার সম্বন্ধে কি সেই একই প্রণালীতে তত্ত্ব খবর লওয়া যায়? সে বাগানে যাহারা যায় তাহারা কি তত্ত্বের জন্য যায় না আনন্দের জন্য যায়? অনেকগুলি দল যে একটি বাঁধনে ধরা দিয়া অখণ্ড একটি ফুল হইয়া উঠিয়াছে ইহাতেই তো আনন্দ, আবার যদি ছুরি ধরিয়া সেই অখণ্ডতাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় তবে আনন্দ থাকে কেমন করিয়া?

আমার মনে হয় যে, ভালো কাব্য বা সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এইটুকু বলাই পর্যাপ্ত যে, ইহা আমার খুব ভালো লাগিয়াছে বা ইহা পড়িয়া আমি বড়ো আনন্দ পাইয়াছি। কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজন করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা। কবি যে ফুল

ফোটান সমালোচক ঠিক তারই পাশে তারই অনুরূপ আর-একটি ফুল ফোটান, ভালো সমালোচনা সেইজন্যই এক রকমের সৃষ্টি। কিন্তু হায়, তেমন সমালোচনার শক্তি কিম্বা সুযোগ কোথায়? ইচ্ছা থাকিলেও ঠিক মনের আনন্দটুকু জ্ঞাপন করিয়া এখন বিদায় লওয়া যায় না। তাহার কারণ, কবির সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে এখন বোঝাপড়া নাই। কবির আসরে পাঠকেরা স্থান পায় না; কবি থাকেন 'hidden in the light of his thought'— আপনার চিন্তার আলোকে আপনি আবৃত। কাজেই বেচারা সমালোচককে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। একবার কবির দরবারে, একবার পাঠকদের আড্ডায়, দুই জায়গায় ঘুরিয়া তাঁহাকে সংবাদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়। যদি লেখকে পাঠকে কোনো ব্যবধান না থাকিত তবে সমালোচকও আপনার কাজ সহজে করিতে পারিতেন। অনেক কথার জঞ্জাল জড়ো করিবার উপদ্রব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না।

'ডাকঘর' ও তাহার পূর্ববর্তী 'রাজা' যে ধরণের নাটক, এ ধরণের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বলা বাহুল্য এ দুইটিই 'হেঁয়ালি'-শ্রেণীভুক্ত। ইহার পূর্বে বোধ হয় 'সোনার তরী' এবং 'পরশপাথর' ধরণের কবিতা ছাড়া কবি আর এমন কিছুই লেখেন নাই যাহার জন্য তাঁহাকে লোকে দুর্বোধ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। ঐ কবিতাগুলিই ঠিক কোনো নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ধরা দিতে নারাজ।

অথচ সেই পূর্বের রূপকজাতীয় কবিতার সঙ্গে আর এখনকার এই নাটকগুলির সঙ্গে আমি ভারী একটি মিল এক জায়গায় দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, ইহাদের মূল ভাব একই, কেবল রূপ স্বতন্ত্র। কতকগুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত ইমোশন অর্থাৎ হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত হয় তাহা নহে। প্রেম ভক্তি করুণা সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের

মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায় তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট হইবার নহে। কারণ, সেই বিশেষ অনুভূতিটাই কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেইকারণে তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন হইয়া বসে। তখন symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইশারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।

'সোনার তরী' মানেই কোনো বিশেষ রূপ নয়, কিন্তু অপরূপ। কালিদাস বলিয়াছেন যে, 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্', রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মন যখন পর্যুৎসুক হয় তখন 'জননান্তরসৌহৃদানি', জন্মজন্মান্তরের ভালোবাসার কথা মনে পড়ে। এই যে একটি রস ইহাকে কী নাম দিব? উপলক্ষটা হয়তো কোনো বিশেষ রূপ বা বিশেষ ধ্বনি, কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া মন যে উতলা হয় সে এমন একটি অপরূপ সুদূরের জন্য, যাহার কোনো নাম নাই, রূপ নাই। বর্ষার ভরা নদী হয়তো 'সোনার তরী'র উপলক্ষ, কিন্তু সে যে বিরহকে জাগায় তাহা আর তাহাকে আশ্রয় করিয়া তো থাকে না।

কিন্তু কেনই বা সিম্‌বল্ লইয়া এত বকাবকি করিতেছি? আমাদের দেশে এটা তো অপরিচিত জিনিস নহে। হিন্দুর ধর্মকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প, সমস্তই ভাবের বিগ্রহে আগাগোড়া মণ্ডিত। হিন্দু তো এ কথা বলে না যে, ভাবকে কোনোদিন কেহ জানিয়া, ব্যবহার করিয়া, বলিয়া শেষ করিয়া দিতে পারে। সেইজন্যই তো সে চিহ্ন মানে, বিগ্রহ মানে— সে জানে যে, ভাব অসংখ্যরূপে আপনাকে ক্রমাগত লীলায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সেই-সমস্ত রূপরূপান্তরকে অনন্তগুণে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করে। হিন্দুর চিত্ত কেন না বলিবে যে, 'সোনার তরী' বল, 'চিঠি' বল, 'পরশপাথর' বল, 'রাজা' বল, ও সমস্তই ছল— অনন্ত সৌন্দর্যের বোধকে একটি মূর্তির মধ্যে ক্ষণকালের মতো বাঁধিবার আয়োজন; ও যে ছল এইটুকু উহাকে দিয়া বলানোই উহার চরম সার্থকতা।

আসল কথা, অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয় কী করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়। কারণ, রূপ যে সীমাবদ্ধ, সে এমন ভাবকে কী করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক। উপমা খানিকটা বাঁধে, খানিকটা আলগা রাখে। সে বাঁধন এতই সুকুমার যে তাহার আবরণ সরাইয়া ভাবকে দেখা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

আশা করি, আমি কেন পূর্ব পূর্ব কোনো কবিতা' এবং আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছি তাহা পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়াছে। আমি বলিতে চাই এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপের ভিতরে অপরূপকে দেখিবার জন্য একটা বেদনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে অপরূপের ভাবটিকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে যাহাতে সে নির্দিষ্ট না হইয়া উঠে। অর্থাৎ, তাঁহাকে সিম্‌বল্‌ আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

সিম্‌বল্‌ লইয়া এত ব্যাখ্যাবাহুল্য করিবার আর-একটু কারণ আছে। সিম্‌বলের ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, তবে 'সোনার তরী'টা কী, তাহার উদ্দিষ্ট মানুষটি কে? সোনার ধানটা কী? অমল কি তবে মানবাত্মা? চিঠি মানে কি মুক্তি? অর্থাৎ, তাঁহারা সমস্ত একেবারে সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে চান। আধ্যাত্মিক সত্যকে এই-সকল লোকই বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো পরিষ্কার না দেখিতে পারিলে অধীর হইয়া উঠেন এবং ধর্মকে কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে উদ্যত হন। ইহারা একটা কথা মনে রাখেন না যে বুদ্ধির উপরেও মানুষের একটা intuition, একটা সহজ প্রত্যয় আছে; বুদ্ধি যেখানে নাগাল পায় না সেইখানে তাহার শরণাপন্ন হইতে হয়।

২

'ডাকঘর'কে সিম্‌বলিক্যাল অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাট্য নামকরণ করা গেল। এটা ঠিক নাম নয়, কিন্তু নির্দেশমাত্র। এখন দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহা নাটিকা বটে, অথচ ইহার মধ্যে নাটকত্ব কিছুই নাই, ঘটনাও বড়ো নাই। তবে ইহাকে 'সোনার তরী' গোছের কবিতার মতো করিয়া লিখিলেই হইত, নাটিকা বলিয়া আড়ম্বর করিবার কী প্রয়োজন ছিল?

একটি রুগ্ন বালকের সৌন্দর্যমুগ্ধ কল্পনাপীড়িত চিত্ত বিশ্বের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল, শুধু এই ভাবটুকু যদি থাকিত তবে তাহা গীতে ব্যক্ত করা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধবদত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ-বা অনুকূল, কেহ-বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূলভাবটুকুকে সূত্রের মতো করিয়া এই-সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া একটি স্ফাটিক ব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার সমাবেশেই তো নাট্যরস। শুধু একটিমাত্র ভাবের রস হইলে গীতিকবিতার রূপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। সুতরাং এ নাটিকার শেষ পর্যন্ত না পড়িলে পুরা রসাস্বাদন হয় না, ইহা মাঝখানে পড়িয়া থামিবার জো নাই।

ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলেই কি সব সময়ে ঔৎসুক্য বেশি করিয়া জাগে? আমার তো মনে হয়, ভিতরের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যেমন ধরো 'গোরা' উপন্যাসটি। তাহার উপাখ্যান-অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানবহৃদয়ের কী বেগবান প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত ঐ উপন্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে— অধ্যায়ে অধ্যায়ে, এমন-কি ছত্রে ছত্রে, যে ঔৎসুক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে এমন কোন্ ঘটনাবহুল উপন্যাসে থাকে আমি তো জানি না।

এই নাটিকাটিতেও কবিজীবনের যে-সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে-সকল সূক্ষ্ম অনুভাব নানা স্থানে মূর্তিলাভ করিয়াছে, কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে পদে পদে বিস্ময় অনুভব করিতে থাকিবেন। ঠিক যেন একটি অজানা দেশের মতো। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়— তাহা ছাড়া তাহার নানা গলিঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটিকাটি সজীব হইয়া আছে।

৩

মাধবদত্ত সংসারী লোক, সে তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্ন— শরতের রৌদ্র আর হাওয়া যাহাতে ছেলেটি না লাগায়, সে বিষয়ে কবিরাজ মাধবদত্তকে সতর্ক করিয়া গিয়াছে। অমলের মন বাহিরে যাইতে না পারিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। সে তাহার বাড়ির জানালার নিকট বসিয়া থাকে— দূরে পাহাড় দেখা যায়— পাহাড়ের নীচে ঝর্না, ঝর্নাতলায় ডুমুরগাছ। জানালার সামনেই রাজ-পথ— ফিরিওয়ালা সুর করিয়া ফিরি করে, রাজার প্রহরী মধ্যাহ্নের স্তব্ধ-তার মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। ঐ দূর পাহাড়, ঐ ঝরনা, ঐ ফিরিওয়ালার সুর, ঘণ্টার ঢং ঢং তাহাকে আনমনা করিয়া দেয়— কোন্ সুদূরের একটি ডাক তাহার বুকের মধ্যে বহন করিয়া আনে।

'জীবনস্মৃতি' এবং 'ডাকঘর' প্রায় একই সময়ে বাহির হইয়াছে, সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি না কি? সেই ফিরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনাভারাক্রান্ত মন— এ তো কোনোমতেই আমাদের অপরিচিত নয়।

'কণিকা'য় 'কবির বয়স' কবিতায় কবি তাঁহার কেশে পাক ধরিয়াছে

শুনিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সকলের সঙ্গে একবয়সী। প্রৌঢ় বয়সে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী!
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে—

তাহার সুরের সঙ্গে বাল্যজীবনস্মৃতির সুর মেলে এবং ডাকঘরেরও সুর মেলে। কবির বয়স যে চিরকাল সমানই থাকিয়া যায় তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যায় বটে।

বাস্তবিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূল ভাব।

কবির মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, তিনি অনেক সময় এই পৃথিবীর পরিচিত দৃশ্য শব্দ গন্ধকে এমন ভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যেন এই পৃথিবীতে তিনি সদ্য আসিয়াছেন। এখানে সমস্তই যেন নূতন, কিছুই যেন তাঁহার পরিচিত নহে। এই-যে নিকটতম অভ্যস্ততম পরিচিততম জিনিসকে বহুদূরের একটি বিরলব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে ছাড়া দিয়া দেখা, ইহাতেই অভ্যাসের ও পরিচয়ের জড় আবরণ তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া যায়, সে আশ্চর্য সুন্দর হইয়া উঠে।

এমন করিয়া দেখিলে সমস্তই কী রহস্যময়! দইওয়ালা যে রাস্তা দিয়া দই হাঁকিয়া চলিতেছে, সে তো একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়। তাহার চারি দিকে কত দূরদূরান্তরের কত সৌন্দর্য ঘিরিয়া আছে— সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় সৌন্দর্য, সেই শামলী নদীর সৌন্দর্য, সেখানকার সেই লাল মাটির রাস্তাটি, বড়ো বড়ো গাছের ছায়া, পাহাড়ের গায়ে যে গোরু চরিতেছে তাহাদের সৌন্দর্য, সেই-যে গোপবধূরা ডুরেশাড়ি পরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের সৌন্দর্য, সেই গ্রামের সমস্ত স্নেহ-প্রেম-মাধুর্যের কত সৌন্দর্য! এই-সবই সেই দইওয়ালাকে বেষ্টন করিয়া

আছে। তাই তো সে এমন রমণীয়। তাই তাহার ফিরির স্বরটিকে বিশ্ববাঁশির মতো সকরুণ করিয়া দিয়াছে। বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোনো মাহাত্ম্যই নাই।

তেমনি ঐ-যে সম্মুখের পথটি, তাহারও রহস্য ঐখানে— সে যে বহু-দূরের যাত্রীকে ক্ষণিকের মতো, চকিতের মতো, একবার ঐ একটি জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেখাইতেছে; বলিতেছে, অনন্ত প্রবাহের একটি-মাত্র পরিপূর্ণ মুহূর্তের ছবিখানি দেখো! অনন্ত সমুদ্রকে একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যে দেখো! ইহার পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র, ইহার সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, সেই-সমস্ত প্রবাহ যেন এই একটি তরঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তার মানে কী? তার মানে এই যে, আমরা এখানে যাহা-কিছু দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা ক্রমাগতই চলিবার মুখে, সরিবার মুখে। আমরা তাহার আদিও জানি না, তাহার অন্তও জানি না, জানি শুধু তাহার মাঝখানের খণ্ড একটুখানি কালের কথা। সেই খণ্ডকালে যেটুকু যাহা দেখিতেছি তাহাকেই বাস্তব বলিয়া, সত্য বলিয়া যে আমরা চাপিয়া ধরি, তাহাতেই তাহাকে হারাই, তাহার যথার্থ সত্তাকে পাই না। যদি সেই খণ্ডকালের খণ্ড জিনিসের উপর তাহার অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের একটি আলো ফেলিয়া সে খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডের পরিচয় পাই, তবেই সেই জিনিস আশ্চর্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহা তখন এক দিকে ব্যক্ত, অন্য দিকে অব্যক্ত; এক দিকে সসীম, অন্য দিকে অসীম; এক দিকে রূপ, অন্য দিকে অপরূপ। তখন সে কী বিস্ময়, কে তাহা বর্ণনা করিবে?

এ তত্ত্বের কথা নয়, কিন্তু দৃষ্টির কথা। এই দৃষ্টি লইয়াই কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধি যে মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সঙ্গে যে কেবল বহির্বিষয়মাত্রের যোগ, মানুষের অধ্যাত্মপ্রকৃতির গভীরতা পরিমাপ করিতে বুদ্ধি যে অক্ষম, এ-সকল কথা আধুনিক যুগে ইউরোপের

তত্ত্বজ্ঞানীদল স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ আঁরি বের্গ্‌সঁ বলেন, 'আমাদের বুদ্ধি এবং বাহিরের বিষয় পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। চৈতন্যকে যদি বুদ্ধির গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখ তবে তাহা বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িবে।' সুতরাং বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমগ্রতা তাহার নাই। কিন্তু যাঁহারা মানবচিন্তা যে কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার কোনো সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা সকল বড়ো জিনিসকেই পরিহাস করিতে থাকিবেন। ইহাদেরই জন্য কি ম্যাথ্যু আর্নল্ড্‌কে 'ফিলিস্‌টাইন' কথাটা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল?

৪

ডাকঘরের মূলভাব নাহয় বুঝা গেল, কিন্তু 'ডাকঘর' 'চিঠি' 'রাজা' প্রভৃতি ব্যাপার কী। এই-যে কল্পনাব্যাকুল সৌন্দর্যানুভূতিময় চিত্ত ইহাকে রুগ্ন করিয়া, ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবারই বা তাৎপর্য কী এবং রাজার চিঠির জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিবারই বা অর্থ কী।

আমরা যে রুগ্ন এবং বদ্ধ কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কী প্রয়োজন আছে? আমরা বাহির হইতে চাই এ কথাটা যতখানি সত্য ততখানি সত্য এই কথাটাও যে, আমাদের অন্তরে বাহিরে নানা বাধা জড়াইয়া আছে। বারবার কি আমাদের বদ্ধ ঘরে অভিসারের বাঁশির ডাক আসে না? কিন্তু হায়, বাঁধন কি একটি, নিষেধ কি সামান্য? মাধবদত্ত-কবিরাজ-রূপী সংসার তো আছেই, সুধাও আসিয়া যে-আধখানা দরজা খোলা আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চায়।—

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি!

কিন্তু কল্পনা তো বাঁধ মানে না, সে যে পাখা মেলিয়া সর্বত্র উড়িতে চায়। তার পণ সে সব দেখিবে, সব-কিছুর আনন্দ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তাহাকেও কুলায়ে ফিরিতে হয়। তখন বলিতে হয়—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।

এইরূপে কবির জীবন যখন গিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে মিলিয়া যায় তখন ঐ একটিমাত্র ইচ্ছা প্রাণ জুড়িয়া বাজে যে, তাঁর চিঠি চাই— তিনি কবে আসিবেন ? সেইখানেই যে সমস্ত বিচিত্রতার অবসান, সেইখানেই সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি।

নাটিকার মধ্যে এই-যে এক ভাব হইতে আর-এক ভাবে গিয়া পড়িতেছি, ইহাতেই তাহার মধ্যে একটি গতিসঞ্চার হইয়াছে। এখন আর পথের ধারে 'অনেকের সনে দেখা' নয়, এখন ঘরের মধ্যে চিঠির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা ; এখন আর বহুবিচিত্রতাময় দিন নয়, এখন শীতল অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি।

নাটিকার পরিণামটা আমার স্পষ্টতই মৃত্যু বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠক মাত্রেই জানেন যে তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না, তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বলিয়া মনে করেন। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে এই ভাব, 'ঝর্নাতলা' কবিতাটিতেও এই একই ভাব, যে, জীবনে যেটা ঝর্নারূপে সাত পাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়া নদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে— মৃত্যু ছেদ নয়, সে পরিপূর্ণতা।

শুধু তাই নয়। পূর্বের কোনো কোনো কবিতাতে কবি 'মৃত্যু-মাধুরী'র কথাও বলিয়াছেন।

পরান কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর এ কি তব অন্তঃপুর ?

মৃত্যু যেন একটি পরিপূর্ণ সুদূর, সমস্তই তাহাতে বিলম্বিত হইয়া সীমা আবরণ উন্মোচন করিয়া মধুর হইয়া উঠে। আমরা একটু আগে ডাকঘরের যে মূল ভাবটির কথা আলোচনা করিয়াছি, মৃত্যুকে এমন পরিপূর্ণ ও মাধুর্যময় করিয়া দেখিলে সে ভাব মৃত্যুর সঙ্গে দিব্য সংগত হয়।

কারণ, কিছুই যে থাকিবে না, সেইজন্যই তো বাস্তবিক সমস্তই এমন সকরুণ, এমন সুন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই জগতের কোথাও কোনো ভার নাই। সমস্তই একটি সুদূরের ব্যাপ্ত বিষাদে বেদনার মতো বাজিতেছে। সুতরাং এখানে মৃত্যু যদি পরিণাম হয় তবে তাহাকে কোনোমতেই খাপছাড়া বা আকস্মিক বলা চলে না। কবি যে বলিয়াছেন—

সে এলে সব আগল যাবে ছুটে,
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে !

মৃত্যু যেন একটি বন্ধনমোচনের আনন্দ হইয়া উঠিবে।

তবে কি রাজার চিঠির জন্য অমলের যে ব্যাকুলতা সে এই মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা ? না। সে কথা বলিলে রাজার চিঠিকে অত্যন্ত ছোটো করিয়া দেখা হইবে।

রাজা যে অমলের মতো ছোটো মানুষের কাছে আসিতে পারেন এই কথাই তো মোড়ল-জাতীয় লোক বিশ্বাস করে না, তাহারা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে, তিনি রাজা, তিনি কেবল বড়ো বড়ো মানুষকেই দেখা দেন। কিন্তু তাঁহার যে-একটি আনন্দ ঐ ছোটো বালকের উপরেও অনন্ত হইয়া আছে, উহার নামে যে তিনি কোন্ অনাদিকাল হইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কতবার যে সেই লিপির আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে, তাহা কি মোড়ল-জাতীয় বুদ্ধিজীবী অবিশ্বাসীরা জানে, না মাধবদত্তের মতো ঘোর

সংসারীরা জানে? একমাত্র লোক যে সেই বার্তা জানে সে ঠাকুরদা।

'শারদোৎসব' নাটকের সময় হইতেই এই ঠাকুরদাকে কবির প্রয়োজন হইয়াছে। এই একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ, যে সকলের সঙ্গে সব হইয়া আছে, যে পরিপূর্ণ আনন্দকে জানে— ইহাকে নহিলে কবির কল্পনাগুলি সমর্থন পাইবে কেমন করিয়া? সোনার তরী, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, হাক্কা দেশ প্রভৃতি ব্যাপার যে সত্য সত্যই আছে, সে কথার সাক্ষ্য ঠাকুরদা ভিন্ন দিবে কে? ফিলিস্টাইন-দলকে শাসাইয়া সংযত করিয়াই বা রাখিবে কে?

ঠাকুরদা বলিতেছেন, 'শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে।' কিন্তু কবে?—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।

অমল উত্তর করিতেছে, 'তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি— সে অনেক দিন আগে— কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে— বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধ'রে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্নার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলই চলে আসছে— নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই আসছে; তার পর আখের খেত, সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে— রাতদিন একলাটি চলে আসছে; ··· যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারী খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।'

সুতরাং এ চিঠি কখনোই সে চিঠি নয় যে, 'অমুক দিন অমুক সময়ে তোমার মৃত্যু ঘটিবে।' এ চিঠি সেই চিঠি যে, 'আমি তোমাকে বড়ো

আদর করিয়া আমার এই আহ্বানলিপি পাঠাইলাম। তুমি আমার, তোমাতে আমার আনন্দ আছে।'

আমি এই জায়গায় আমার পাঠকদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি'-নামক কবিতাটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। সে চিঠিখানিও বিশ্ব-চিঠি, তাহার লিখন কবি জানেন না, কে লিখিয়াছে তাহাও জানেন না—কিন্তু পাইয়াছেন এই সুখেই তিনি খুশী, তাঁহার বুকের ভিতরটা আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে।

অমল তাই ঠাকুরদাকে বলিতেছে যে, প্রথমে যখন তাহাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিল তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, এখন ডাকঘর দেখিয়া অবধি প্রত্যহই তাহার ভালো লাগে, 'ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে।' 'একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে করলেই আমি খুশী হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারি।'

৫

এইবার পরিণামে আসা গিয়াছে। চিঠি পাইবার ভরসার পর পরিণাম সত্যই পরিণাম, পরিণাম পরিপূর্ণতা।

প্রথমে আমরা বিশ্বে বাহির হইবার ব্যাকুলতা দেখিলাম, তার পর রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ঘরে চুপ করিয়া থাকিতেও ভালো লাগে দেখিলাম। এখন দেখি, 'চোখের উপর থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না?'

বোধ হয় জগতের কোনো কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই, জীবনে মৃত্যুতে যে বিবাহের অতিনিবিড় সম্বন্ধ সে কথা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মাঝের বয়সের কবিতায় জীবন ছিল 'বালিকা বধূ', তখন তাহার বরকে ভয় করিত— 'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় তাই তিনি আরও কিছুদিনের মতো খেলাধুলার ঘরের মধ্যে বাস করিবার

অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষবয়সের কবিতায় ক্রমাগতই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

সুতরাং রাজদূতকে তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে উপস্থিত করেন তাহাতে কিছুই আশ্চর্য নাই।

তবু শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সংশয় যায় না। বাহির হইতে মোড়লের অবিশ্বাসের পরিহাসের খোঁচাও আছে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে সত্যকেই অবিশ্বাস করে কিনা, সে হাঁ'কেই না বলিতে চায় কিনা, তাই তাহার অবিশ্বাসই তাহার বিশ্বাসকে যথার্থরূপে পাইবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকে সে যত আঘাত করে ততই তাহার নিজের অবিশ্বাসের প্রাচীর একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যায়, শেষে সে দেখে যে সে পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য সত্যই ঘটে। সে জানে না যে, অক্ষরশূন্য কাগজেই রাজার চিঠি আসে। কারণ, তাঁহার চিঠির তো বাহ্যিক কোনো নিদর্শন নাই, সে চিঠি আমাদের আশা এবং নির্ভরের ভিতরে আসিয়া যে পৌঁছায়। মুড়ি মুড়কি খাইতেও তিনি সামান্য লোকের ঘরেই আসেন— কারণ, তাঁহার আসা যে নিঃশব্দ গোপন— তিনি তো আগেভাগে জানাইয়া কাহাকেও দেখা দেন না। সে একেবারেই আচমকা হঠাৎ আবির্ভাব, তাহার জন্য কেহই কখনোই প্রস্তুত থাকে না। মোড়লের পরিহাসের মধ্যে ঠাকুরদা এই সত্যটিকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি অমলকে ইহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতেই দিলেন না। রাজারই চিঠি আসিয়াছে! রাজাই স্বয়ং আসিতেছেন! হাঁ, এই কথাই সত্য।

তার পর রাজদূতের প্রবেশ এবং রাজ-কবিরাজের আগমন। দ্বার ভাঙিয়া গেল, প্রদীপ নিবিয়া গেল, ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা এক নিমেষে খুলিয়া গেল; অর্ধরাত্রে রাজা আসিবেন শুনা গেল। অমল স্থির

করিল যে, সে তাঁহার ডাক-হরকরার কাজটি প্রার্থনা করিবে। বাস্তবিক কবি কি সেই কাজই করেন না? শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো তাঁহার প্রধান কাজ।

নাটিকা সমাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য কৃতিত্ব যে, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবননাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সূত্রের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা, সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি, সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়তো একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন; কোথাও-বা সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন-সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন সুধার কথা। সে অমলের আধখানা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তাহার সেই ক্ষণিক মোহটুকু সে অমলের মৃত্যুর পরেও রাখিয়া গেল; সে বলিল, ও যখন জাগিবে তখন বোলো যে 'সুধা তোমাকে ভোলে নি'। এই এতটুকুর মধ্যে সমস্ত নারীপ্রকৃতির একটি রহস্য কবি কৌশলে ছুঁইয়া গিয়াছেন। শেষ ক'টি কথা ব্রাউনিঙের Evelyn Hope-এর শেষ ছত্রগুলি মনে করাইয়া দেয়। মৃত এভেলিনের প্রণয়ী বলিতেছে, 'এই একটি পল্লব আমি তোমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলাম; ঘুমাও, যখন জাগিবে তখন তোমার মনে পড়িবে, তখন সব বুঝিতে পারিবে।'

এমন ইঙ্গিত কতই আছে।

ইউরোপেও বিগ্রহরূপী নাটকের যুগ শুরু হইয়াছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটি মেটারলিঙ্কের নাট্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। লরেন্স অ্যালমা টেডেমা প্রভৃতি মেটারলিঙ্কের সমালোচকবর্গ তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধর্মের জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন অধ্যাত্ম-

বোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কি সে চেষ্টা নাই? তিনিও আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্মদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল তেমন বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না— স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোনো গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার, সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি একান্ত প্রয়াস নাই?

১৩১৮

ভালো আত্মজীবনীর বিশেষত্বই এই যে, তাহা জীবনকে কেবল বাহিরের কতকগুলি ঘটনার জড়সমষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলিত কয়েদীর মতো করিয়া দেখায় না। তাহা জীবনের অন্তরতম স্থানের একটি গভীর অভিপ্রায়ের সূত্রে বাহিরের ঘটনাগুলিকে এমনি মালার মতন গাঁথিয়া তোলে যে, জীবনের সকল বৈচিত্র্যেরই একটি বড়ো তাৎপর্য দীপ্যমান হইয়া উঠে। জীবন যে বাহির হইতে কেবলই নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত, সে যে বদ্ধ নয়, কিন্তু মুক্ত— এ কথা আমরা তখন সহজেই বুঝিতে পারি।

কিন্তু এমন করিয়া আপনাকে উদ্ঘাটিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, নিজের কথা বলিতে গেলেই মানুষ অতিসচেতন হইয়া পড়ে— তখন তাহার কথার মধ্যে স্বচ্ছতা থাকে না, দেখিতে দেখিতে মিথ্যা ও ভান আসিয়া দেখা দেয়। আপনাকে না ভুলিতে পারিলে, আপনাকে অন্য লোকের মতো করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পারিলে, আত্মজীবনী লিখিতে পারা যায়, ইহা আমার বিশ্বাস নহে। কিন্তু সেই আপনাকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র করা সকলের চেয়ে কঠিন-সাধনা-সাপেক্ষ। এইজন্য সাহিত্যে যথার্থ আত্মজীবনী লেখা সকলের চেয়ে শক্ত ব্যাপার। এখানে পদে পদে অহমিকা ও আত্মপ্রতারণার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহা এত দুরূহ।

ইউরোপে বহুদিন হইতে অনেকে এই কার্য করিয়া আসিতেছেন। সেইজন্য দেখা যায় যে, মানুষ সেখানে আপনাকে অনেকটা পরিমাণে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সেণ্ট্ অগস্টিনের কন্‌ফেশন্‌সে যে-সকল পাপের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের কোনো সাধু মহাত্মা অমন অসংকোচে বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কবি গ্যয়্‌টে তাঁহার আত্মজীবনী যেভাবে লিখিয়াছেন তাহা

আমাদের দেশের কোনো কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় বলিয়া মনে করি না। তাহার কারণ, মানুষের জীবন যে একটা অভিব্যক্তির লীলাক্ষেত্র সেই কথাটা আমাদের চেতনায় যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জল হইয়া উঠে নাই।

কবি রবীন্দ্রনাথ যে 'জীবনস্মৃতি' লিখিয়াছেন, তাহার নামেই পরিচয় যে, তাহা আত্মজীবনী নহে। বাল্যজীবনস্মৃতিই এই গ্রন্থের চারি ভাগের তিন ভাগ স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। অর্থাৎ, জীবনের কথা যতদূর পর্যন্ত অত্যন্ত নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে বলা যায় ততদূর পর্যন্ত কবি অগ্রসর হইয়াছেন, তার পর শক্তির অভাবের দোহাই দিয়া বিদায় লইয়াছেন। আপনার কথা নিতান্ত সহজে আত্মবিস্মৃতভাবে বলা যে কত কঠিন তাহা কবি নিশ্চয় ভালোরূপেই জানেন। এই গ্রন্থের মধ্যেও তাহার প্রমাণ যে মধ্যে মধ্যে পাই নাই এমন কথাই বা কী করিয়া বলি। যেখানেই তাঁহার নিজের রচনার কথা আসিয়াছে সেখানেই কবি পরিহাসের পর্দার আড়ালে সরিয়া গিয়াছেন— বেচারা রচনা বাহিরের লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির মধ্যে মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুর মতো অসহায় ও সকরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভানুসিংহের কবিতা, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যা-সংগীত, ছবি ও গান প্রভৃতি রচনার আলোচনা দেখিলেই এ কথার সত্যতা বুঝা যাইবে। এই সমালোচনাগুলি যে অসংগত বা অন্যায় হইয়াছে তাহা বলিতেছি না। কারণ, এ সমস্ত রচনাই এত কাঁচাবয়সের যে, সে সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন, নিরপেক্ষ সমালোচক হয়তো তদপেক্ষা তীব্রতরভাবে লিখিতে পারিত। কিন্তু কবির যে-একটি সসংকোচ কৌতুকলীলা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতেই বেশ বুঝা যায় যে ঐটি তাঁহার প্রকৃতিগত— তিনি যদি আরও অগ্রসর হইতেন তবে পরিণত বয়সের রচনাগুলিরও অবস্থা অতদূর শোচনীয় না হোক, খুব আরামের হইত না বোধ হয়।

কিন্তু যাহা পাই নাই তাহার জন্য আক্ষেপ থাকিলেও সে আক্ষেপ

বৃথা। কবির 'জীবনস্মৃতি'তে জীবনচরিতের স্বাদ না পাইলেও একটি জিনিস ইহার ভিতরে পাওয়া গিয়াছে, যাহা যে-কোনো ভাষায় অতুলনীয়। কবি গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছেন যে, স্মৃতির পটে জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হয় তাহা ইতিহাস নয়, অর্থাৎ যাহা বাহিরে ঘটিতেছে তাহার যথাযথ নকল নয়। তাহা 'এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।' জীবনের সেই নানা বিচিত্র স্মৃতিচিত্রের আনন্দরসে এই গ্রন্থখানি ভরপুর। সেইজন্য ইহা এমন আশ্চর্য। মানুষের জীবনের সকল প্রকারের স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপূর্ব একটি চিত্ররস থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব হইত না।

আমি দেখিয়াছি, সাহিত্যে অধিক কথার ভার চিত্ররসের পক্ষে ব্যাঘাতকর। নির্মল জলেই যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ চিন্তার গুরুভারকে সরাইতে না পারিলে লেখা নানা চিত্রে প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র রাগে রঞ্জিত হইবার মতো স্বচ্ছতা লাভ করে না। কবির অনেক বড়ো বড়ো কাব্যে তিনি অনেক বড়ো বড়ো কথা বলিয়াছেন— কিন্তু 'ক্ষণিকা'য় কোনো বড়ো কথা বলিবার ছিল না বলিয়া, 'শুধু অকারণ পুলকে' ক্ষণিক সৌন্দর্যের মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দে ডুব দিবার আয়োজন ছিল বলিয়া তাহা বাংলার গ্রাম্যপ্রকৃতির অমন সুন্দর চিত্রমালা হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক ক্ষণিকায়—

> শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
> কলাপের মতো করেছে বিকাশ।

রঙের এমন ছড়াছড়ি, ছন্দের এমন নৃত্যলীলা, কোনো কাব্যে কি কখনও দেখা গিয়াছে?

এবারেও জীবনচরিত লিখিবেন না বলিয়াই কবি জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছিলেন। তাই শুধু নিজের বাল্যজীবনের চিত্র নয়, বাড়ির চিত্র, পরিবারমণ্ডলীর চিত্র, তৎকালীন সমাজের চিত্র, নানা লোকচিত্র,

ও প্রকৃতির দৃশ্যচিত্রে গ্রন্থখানি পূর্ণ করিয়া আমাদের হাতে আনিয়া দিয়াছেন।

এই স্মৃতিচিত্রে যে রঙ পড়ে সে এমন একটি মোহ-মাখানো কল্পনার রঙ যে, আমার বিশ্বাস, কবি যদি চিত্রশিল্পী হইতেন তবে শুদ্ধমাত্র শব্দে সেই রঙ লাগাইয়া তিনি তৃপ্তিবোধ করিতেন না। কিন্তু চিত্র আঁকা তাঁহার আসে না বলিয়া ভাষাতেই চিত্রবিলাসকে মিটাইতে হয়। তথাপি নিপুণ শিল্পীর তুলিতে এই স্মৃতিচিত্রগুলি কী আকার ধারণ করিতে পারে তাহা শুধু কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষরূপে দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থে কবির সরস হাতের ভাষার চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্র যুক্ত হইয়া মণির সঙ্গে কাঞ্চনের যোগের মতো অপূর্ব শোভা খুলিয়াছে। আমরা তো চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; তথাপি গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বর্ণনার যে একটি মোহরস কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছে, দেখিতেছি সেই মোহের স্বপ্নাঞ্জন তুলিকায় মাখাইয়া অনতিস্ফুট বিভাসে শিল্পী তাঁহার প্রত্যেকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সকল চিত্রগুলিই আমাদের ভালো লাগিয়াছে— তবে কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে শুধু ভালো লাগিয়াছে বলিলে অত্যন্ত অল্প করিয়া বলা হয়। প্রথমত বাড়ির ভিতরের সেই বাগানের চিত্রটি, যাহা তরুণ বালকের নিকটে 'স্বর্গের বাগান' ছিল। সেখানে বেশি গাছপালা ছিল না, একটা বাঁধানো চাতাল মাত্র ছিল। কিন্তু দুইটি নবীন চক্ষুর নিকটে তাহাই পর্যাপ্ত ছিল। অঙ্কিত ছবিটিতে সেই অল্পের মধ্যে যে একটি ভরপুর বিস্ময় ও আনন্দ, একটি নিত্যজাগ্রত কৌতূহল, তাহা অস্পষ্ট ছায়াভাসে এমন স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। তার পর সেই রাত্রে বারান্দায় বসিয়া দাসীদের সলিতা পাকানো ও বিশ্রম্ভালাপের চিত্র। একটুখানি অংশে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে, বারান্দার অবশিষ্ট অন্ধকারময় অংশে তাহারা বসিয়াছে। চিত্রটি রাত্রির রহস্যে কী পরিপূর্ণ! জ্যোৎস্নালোক

রাত্রির সকল আবরণ উন্মোচন করিতে পারে নাই— যে রহস্যভবনের ভিতরে কত কালের কত রূপকথা, কত স্বপ্ন, কত দূরদূরান্তরের কলগুঞ্জন নিবিড় হইয়া আছে, তাহারই এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না উঁকি মারিতেছে। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। তার পর, সম্পূর্ণরূপে আইডিয়াল চিত্র যেগুলি, সেগুলিই বা কী চমৎকার! যেমন 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন সনে' এই গানটির চিত্র। দুপুরবেলার আলস্য-জড়ানো যে একটি ঔদাস্য আছে, বহুদূরের স্বপ্ন যখন মনকে উতলা করিয়া তোলে— ঐ গানটিতে সেই উদাস ব্যাকুলতার একটি সুর আছে। গানটির কথার মধ্যে সেই সুরটিকে ধরা যায় না. কিন্তু গানটি দুপুরে গুন্ গুন্ করিয়া কেহ গাহিলেই তৎক্ষণাৎ মন তাহার অনুরণনে ঝংকৃত হইতে থাকে। এমন একটি সুরকে রূপে ধ্যান করা বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। এই ছবিটি তাই কল্পছবি— মানসবনের লীলাপুষ্পের গন্ধ খচিত ছায়াছবি। সকল ছবিই এমনি অপরূপ— তাহাদের পরিচয় দিতে যাওয়া বৃথা; তাহারা নিবিষ্টভাবে উপভোগের জিনিস। যেগুলি মানুষের চিত্র, যেমন শ্রীকণ্ঠ সিংহের, তাহাদের ভিতরেও অন্তরের প্রতিকৃতিটি কেমন সহজেই উঠিয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক এই চিত্রগুলি এ গ্রন্থের বহুমূল্য অলংকার।

আমি বলিয়াছি যে. 'জীবনস্মৃতি'তে কবির বাল্যস্মৃতি গ্রন্থের চারি ভাগের তিন ভাগ স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক বয়স্ক পাঠক ইহাতে মনে মনে আপত্তি করিতে পারেন যে, ছেলেবয়সের কথার মধ্যে এত কী লিখিবার বিষয় থাকিতে পারে? বৃন্দাবনের গোষ্ঠলীলায় ভগবান বালক-বেশে সখাদের সঙ্গে খেলা করেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার বর্ণনা আছে। তার মানে ভগবান শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়াই খেলা করেন— তাঁহার এত বড়ো বিপুল জগৎ একটি শিশুর খেলাঘর বৈ আর কিছুই নয়। সকল মানবের শৈশবের আনন্দলীলাকে যদি সেই অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া

দেখা এ দেশে সত্য হইয়া থাকে এবং আমাদের হৃদয় তাহাকে সেইরূপেই যদি উপলব্ধি করিয়া থাকে, তবে কবির বাল্যজীবনের মাধুর্যময় চিত্ররস আমাদের উপভোগ্য হইবে না কেন? বুড়াবয়সে কবি নিজে যে সেই বাল্যের স্মৃতিগুলি আঁকিতেছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজের কি একটি নিগূঢ় উপভোগ নাই? সেই তাঁহার 'সুকুমার আমি'টিকে তিনি কী করুণ, কী সুন্দর করিয়াই দেখিতেছেন। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার বাল্যজীবন কিছুমাত্র সুখকর ছিল না। 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র শাসনে কত ক্লেশ ছিল, তখন বাড়ির বাহিরেও তাঁহার অবাধ গতিবিধি নাই, ভিতরেও নাই। কিন্তু সেই সুকুমার কিশোরটিকে সেই-সকল ক্লেশে কি কিছুমাত্র ম্লান করিয়াছিল? সেই বাড়ির ধারের বাগান পুকুর ও বটগাছ দেখিয়াই কতদিন তাঁহার আনন্দে কাটিয়াছে। মধ্যাহ্ন-আকাশের খরদীপ্তি ও তাহার স্তব্ধতার মধ্যে চিলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ও ফেরিওয়ালার করুণ হাঁক কী উন্মনা করিয়া দিয়াছে। সেই নারিকেল-তরুশ্রেণী লেবুগাছ ও অন্যান্য দু-একটা তরু-বিশিষ্ট বাড়ির ভিতরের বাগানটিই মানবের আদিম স্বর্গকাননের মতো ছিল; শরতের শিশিরস্নাত সোনালি প্রত্যুষে সেইখানেই কত আনন্দে, কত বিস্ময়ে, হৃদয় কম্পিত হইয়াছে। এই তো শৈশবলীলা— ইহা বৈষ্ণবী গোষ্ঠলীলার ন্যায় কিছু-মাত্র ভাবগত জিনিস (idealised) নয়— কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব হইয়াও চিত্ররসের মোহের জন্য ইহাকে পড়িতে কী অপরূপ কাব্যের মতো বোধ হয়। এ কাব্য বাল্যজীবনের কাব্য।

আমার বিশ্বাস, পরিণত বয়সে কবি যে তাঁহার অপূর্ব 'শিশু' কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, সেও এই স্মৃতি অবলম্বনেই। জীবনস্মৃতির এই গোড়াকার অংশের সঙ্গে তাহার খুবই সাদৃশ্য আছে, তবে কবিতা বলিয়া তাহা খুঁটিনাটি-বর্ণনা-বর্জিত। অথচ সেই খুঁটিনাটির জন্যই এই গ্রন্থে চিত্রগুলি এমন ভরাট হইয়াছে। 'শিশু' কাব্যটি শিশুদের জন্য

রচিত হইয়াছে এই ধারণায় অনেক বয়স্ক পাঠক তাহা পড়েন না জানি। তাঁহাদেরও দোষ নাই— বড়ো বড়ো হরফে বালকদিগের পাঠের সুবিধার্থে কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশকের আড়ালে এখানে আমরা পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি যে, কাব্যটির পুরা রস বুড়া শিশুরাই ভালো-রূপে আদায় করিতে পারিবেন। জীবনস্মৃতির সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া পড়িলে চিত্র ও কাব্য উভয়েরই রস একই কালে পাওয়া যাইবে।

তার পর, ইস্কুল-নামক কলের মধ্যে পৃথিবীর কোনো বড়ো কবিই তৈরি হন না, সুতরাং কবির ছাত্রজীবনের কাহিনীতে বিশেষ উপভোগ্য কিছুই নাই। কিন্তু এই বালককালের পঠদ্দশার বিবরণের মধ্যে দুইটি চমৎকার চিত্র আমরা পাইয়াছি। একটি বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহের চিত্র, অন্যটি কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। এই চিত্র দুইটি কবির জীবনের ভাবের এবং কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিলেও অসংগত হয় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভিতরকার যোগ আছে, সেইজন্য ইহারা কবির কল্পনাকে কেবল স্পর্শমাত্র করিয়া বিদায় লয় নাই, খুব গভীরভাবে আঘাত করিয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশের সম্বন্ধের মতো এই দুইটি চিত্রের পরস্পরের সম্বন্ধ। একটি চঞ্চল, অপরটি শুদ্ধ; একটি আত্মবিহ্বল, অপরটি আত্মসমাহিত; একটি লীলাময়, অপরটি যোগমগ্ন; একটি সজন, অপরটি নির্জন। পূর্ণতার এই দুইটি দিকই কবির কাছে তুল্য আদরণীয়। অল্পবয়সের রচনায় পরিণতবয়সের চিত্র আঁকিবার বেলায় ইহাদের একটি দিকই পুনঃপুনঃ দেখা দিত— ঐ আনন্দবিহ্বল উদার উন্মুক্ত রসোচ্ছ্বসিত দিক। 'বউঠাকুরানীর হাট'এর বসন্তরায় যেমন। কিন্তু অধিক বয়সের রচনায় 'রাজা' প্রভৃতি নাট্যের ঠাকুরদাদার চিত্রে ঐ দুইটি দিকের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়— পূর্ণতা ও পরিণতির ঐ যেন স্বরূপ।

এই একটি কারণ ব্যতীত, মহর্ষির যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা

অন্যান্য কারণের জন্যও ভালো করিয়া প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু কৌতূহলী। তার পর, তাঁহার পুত্রগণের উপর তাঁহার চরিত্রের ও আদর্শের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কতটা পড়িয়াছিল তাহাও জানিবার বিষয়। কিন্তু সকলের চেয়ে একটি কারণে এই চিত্রটি আমার মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়, তাহারই কথা বলিতেছি।

গ্রন্থ হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি তদপেক্ষা অনেক বেশি শিক্ষা যে মানুষের সঙ্গ হইতে লাভ করি, বোধ হয় এ কথাটা মহর্ষি খুব ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য দেখিতে পাই যে, তাঁহার বাড়িটিকে তিনি সর্বপ্রকার শিক্ষা ও অনুশীলনের একটি আদর্শভূত প্রশস্ত ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। সর্বপ্রকারের গুণীব্যক্তিদিগের সেখানে সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা কেহ-বা পণ্ডিত, কেহ-বা ধর্মপ্রাণ, কেহ-বা গায়ক, কেহ-বা রসজ্ঞ, কেহ-বা সাহিত্যিক, কেহ-বা দার্শনিক— কিন্তু সকলেই মহর্ষির নিকটে সম্মান ও সমাদর লাভ করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। নিজের বাড়ির চতুর্দিকে এই প্রকারের একটা বড়ো আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ায়, তাহার শিক্ষাই কবি ও তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃগণের জীবনে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষিগণ মহর্ষির বাড়িতে আপনার লোকের ন্যায় স্থান পাইয়াছিলেন। কবি বাল্যবয়সে বিহারীলাল, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতিকেই অবশ্য অধিক দেখিয়াছিলেন। আমার মনে হয় এই কারণেই সাহিত্য, দর্শন, সংগীত, কলাবিদ্যা, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের একটা সহজ বোধ এবং অনায়াস অধিকার মহর্ষি-পরিবারের একটা বিশেষত্ব হইতে পাইয়াছে। কোনো কালেজি শিক্ষায় তাহা কদাচ হইতে পারিত না।

এইরূপে বাড়ির মধ্যেই শিক্ষার বীজ প্রচুররূপে ছড়ানো হইয়াছিল বলিয়া, এই অনুকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে কবির কাব্যজীবনটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল। কবি এই গ্রন্থের অনেক স্থানেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন : 'ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।··· বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়া উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।··· বাড়িতে কত আনাগোনা··· হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত।' সুতরাং বাহির হইতে ও ভিতর হইতে কী কী কারণ একত্র হইয়া কবির চিত্তের বিকাশের পক্ষে সহায়তা করিতেছিল, এই গ্রন্থ হইতে তাহার ইতিহাসের নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। সর্বদা বিচিত্র প্রকারের সাহিত্য-পাঠ ও আলোচনা-শ্রবণ, গীতচর্চা, নানা লোকের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের যে সুযোগ কবি লাভ করিয়াছিলেন এমন পৃথিবীর কয়জন কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে জানি না। এই বাড়ির শিক্ষাই তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। পৃথিবীতে অনেক স্থানে অ্যাকাডেমি বা অন্য কোনোপ্রকার সংঘ বা সংগত হইতে অনেক ভালো জিনিস উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কেবল একটা পরিবার হইতে ধর্মে কর্মে সাহিত্যে চিত্রে সংগীতে দর্শনে স্বাদেশিকতায় সর্ব বিষয়ে এত বিচিত্র এবং আশ্চর্য উৎকর্ষ ও সফলতা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহা সেই মহাপুরুষের জন্য যিনি দেশের সকল শক্তিকে এমন সহজে আপনার চতুর্দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

অথচ, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কবির জীবন তাঁহার নিজের ভিতর হইতেই একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ— বাহির তাহাকে অল্পই সাহায্য

করিয়াছে। সারালো জমিতে বৃক্ষের বাড়িবার পক্ষে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু আপনার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির দ্বারাই সে বড়ো হইয়া উঠে। কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ যে বলিয়াছেন যে 'genius is the introduction of a new element in the intellectual universe'— প্রতিভা ভাবজগতে একটি নূতন বস্তুর ন্যায় আবির্ভূত হয়, তাহার দ্বারা ভাবজগৎ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে— রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা খুবই সত্য। দুঃখের বিষয়, যেখান হইতে সেই 'new element', নূতন বস্তুত্বের সূত্রপাত, সেইখানেই তাঁহার গ্রন্থের সূত্রও কবি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যৌবনবয়সের রচনা ভগ্নহৃদয়ের প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার কালের ভাবজগৎ সম্বন্ধে একটুখানি আলোচনা করিয়াছেন— তাহা অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি চিত্র হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, তখনকার দিনে ইংরেজি সাহিত্য খাদ্যের পরিবর্তে মাদক জোগাইয়াছিল। হৃদয়াবেগের যে প্রবলতা ইংরেজি সাহিত্যে পাওয়া যাইত তাহার উদ্দীপনা ও মত্ততাকেই সাহিত্যরসভোগ বলিয়া সেই সময়ে কল্পনা করা হইত। ইউরোপে সাহিত্যের হৃদয়াবেগের উদ্দামতা সেখানকার ইতিহাস হইতে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল, আমাদের দেশে সেই ইতিহাস পশ্চাতে না থাকায় উদ্দাম ভাবোচ্ছ্বাস অত্যন্ত অবাস্তব ও অসংযত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেকালের এক দিকে নাস্তিকতা, অন্য দিকে প্রতিমাপূজার ভাবরসসম্ভোগ, উভয়েরই বাস্তববিচ্ছিন্ন ভাবুকতাকে কবি বেশ চমৎকার করিয়াই দেখাইয়াছেন।

এই বস্তুশূন্যতা ও অসুস্থ ভাবুকতা যে কবির রচনাকে প্রথমে অধিকার করিয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার 'new element', নূতন সৃজনী শক্তি, সে অবস্থাকে কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল। জীবনস্মৃতি পাঠ করিয়া আমরা জানি যে, "সেই হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের একটি দ্বার কবির নিকট আবাল্যই উন্মুক্ত

ছিল। সে দরজাটি বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য। কবে একদিন হৃদয়ারণ্যের জটিলতায় পথ হারাইয়া সেই দ্বার খুলিতেই কেমন করিয়া অকস্মাৎ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইল তাহার আশ্চর্য ইতিহাস এই গ্রন্থে আছে। কিন্তু সেই নবজাগ্রত নির্ঝর যখন লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পৌছিল তখনই জীবনস্মৃতির রচয়িতা তাঁহার চিত্রশালা রুদ্ধ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ বৈচিত্র্যময় গতিকে আর অনুসরণ করিতে দিলেন না।

তার পর সে যে কেমন করিয়া আপনার জন্মসংস্কারগত বিশ্বানুভূতিকে নানা বাস্তব সত্যের সঙ্গে ক্রমশই সংযুক্ত করিয়া দেশীয় প্রকৃতি ও দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে এবং একদা দেশের প্রাচীনতম সাধনার মূল ধারার সঙ্গে মিশিয়া বৃহৎ ও বিপুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইতিহাস এ গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। ইংরেজি সাহিত্যের সেই অন্ধ অনুকরণের যুগ, মাঝখানের প্রবল প্রতিক্রিয়ার যুগ এবং আধুনিক কালের দেশীয়-প্রাণে-প্রাণবান সাহিত্যকে সকল মানবের সভায় প্রতিষ্ঠিত করিবার গৌরবময় যুগ— ইহাদের একটা হইতে অন্যটার অভিব্যক্তির ক্রমগুলি কী এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনেই বা তাহা কী ভাবে অনুসরণ করিয়া দেখা যাইতে পারে— ভাবী কবিজীবনরচয়িতার জন্য এই কাজ অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু কবির অন্তরতর জীবনের 'ভাঙাগড়া-জয়পরাজয়ে'র ভিতর দিয়া যে-একটি বড়ো অভিপ্রায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার রহস্যোদ্ঘাটন কবি ভিন্ন কে করিবে? আম-দরবারে এই কালের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ এক রকম করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু খাস-দরবারে তাঁহার অন্তরের মধ্যে তিনি আপনাকে আপনি না দেখাইলে সেখানকার দরজা হয়তো চিরকাল বন্ধ থাকিয়াই যাইবে।

১৩১৯

ছিন্নপত্র

ইউরোপে কোনো বড়ো কবি বা মনীষী মারা গেলে তাঁহার জীবনচরিত, চিঠিপত্র, তাঁহার সম্বন্ধে ছোটো-বড়ো সকলপ্রকার জ্ঞাতব্য সংবাদ মোটা মোটা ভল্যুমে বাহির হইতে দেখা যায়। কবিদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় না— তাঁহারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তৃপ্তি নাই, যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাকেও সকলের ব্যগ্র দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরা চাই।

এইজন্য অনেক সময় অঘটনের সৃষ্টি হয় এ কথা সত্য। এমন অনেক লোকের জীবনচরিত বাহির হয় যাহা বাহির না হইলে জগতের কোনো ক্ষতি ছিল না। চিঠিপত্র এমন অনেক প্রকাশিত হয় যাহা হইতে কবি সম্বন্ধে কোনো নূতন পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিশেষ কিছুই পাওয়া না গেলে তেমন অনিষ্টের হয় না— কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, যে কবিকে তাঁহার রচনায় বড়ো বলিয়া জানিয়াছি, চিঠিপত্রে বা জীবনচরিতে তাঁহার মহিমা খর্ব হইয়া পড়ে। তাঁহার ভাব-জীবন হইতে দৃষ্টিকে সরাইয়া বাস্তবজীবনে ফেলিতেই দেখি যে, মানুষটিকে যেমনটি কল্পনা করিয়াছিলাম তেমনটি নহে।

এ-সকল আশঙ্কার কারণ সত্য হইলেও এখনকার কালে কবিদের প্রচ্ছন্ন থাকিবার কোনো উপায় নাই। কারণ, এ কথা সত্য যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে যতই জানা যাইবে, ততই তাঁহাদিগকে বুঝিবার সাহায্য হইবে। অবশ্য তাঁহাদের জীবনের এমন অনেক দিক থাকিতে পারে যাহার সঙ্গে কাব্যের কোনো সম্বন্ধই নাই, যাহা নিতান্তই বাহিরের দিক। কিন্তু জীবনের ভিতর হইতে যখন কাব্য প্রতিফলিত হইতেছে তখন জীবনের অন্ধিতে সন্ধিতে যতই প্রবেশ করা যাইবে ততই অন্তর্লোকের এমন-সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহা কাব্যের পূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অমূল্য।

এইজন্য ছোটো-বড়ো সকল খবরই চাই— অনেক কিছু সংগ্রহ হইলে তখন তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক স্যাঁৎ ব্যভ (Sainte Beuve) যে-সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের সকলেরই চিঠিপত্র হইতে ও অন্যান্য নানা ছোটোখাটো ঘটনা হইতে তাঁহাদের অন্তরের প্রতিকৃতিটি তিনি আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। জুবেয়ার, মাদাম রোলঁ্যা- শীর্ষক তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে এ কথা সুস্পষ্ট হইবে। ম্যাথু আর্নল্ড্ অনেক সমালোচনায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন।

ইহার কারণ, চিঠিপত্র যে শুধুই সংবাদ বহন করিবার কাজ করে তাহা নহে, চিঠিপত্রও মানুষের ভাবপ্রকাশের একটা উপায়। যেমন নাট্য-উপন্যাসে, যেমন প্রবন্ধ গল্প বা গীতিকবিতায় মনের ভাবকে মানুষ বাহিরে স্থায়ী আকার দান করিয়া সার্থক হয়, চিঠিতেও আর-এক রকমে তাহার সেই কার্যই সাধিত হয়। উপন্যাসে বা নাটকে ব্যক্তিগত প্রকাশের স্থান অল্প— সেখানে চিত্তভাবকে নানা লোকচরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে ছাড়া দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ছোটো গল্পে সে ক্ষেত্র আরো একটু সংকীর্ণ, কবিতাতে বা প্রবন্ধে আরো বেশি— সুতরাং সেখানে নিজের মনের কথা বেশ সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে নিবিড়ভাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে; তাহার কারণ চিঠিতে একমাত্র মনের মানুষকে বলা হয়, বাহিরের পাঠকসমাজ সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।

'যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চারপৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধ কখনোই তা পারে না।'

কবিবর রবীন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র' হইতেই এই অংশটি উদ্ধৃত করিলাম। এই পুস্তকের সকল চিঠিতেই ঐ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক কবি ইহাতে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ইহাতে তাঁহার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনি ধরা পড়িয়াছেন।

সেইজন্য এই চিঠিগুলিতে কোনো কলাচাতুরী নাই, ভাষার ইন্দ্রজাল নাই। নানা লোকের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য কবিকে স্বভাবতই যে-সকল মোহিনী মায়ার আশ্রয় লইতে হয়, নারীর অবগুণ্ঠনের মতো যে কারুপূর্ণ আবরণটুকু নহিলে তাঁহার সৌন্দর্যই প্রকাশ পায় না, এখানে তাহার কোনো আবশ্যকতা ঘটে নাই। কারণ, এখানে একজনের কাছেই সব বলা হইতেছে।

কিন্তু কবির জীবিতকালে এই পত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া ইহাদিগকে তিনি ছিন্ন আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, সবটা দিতে পারেন নাই। সম্ভবত সংকোচ তাহার কারণ। এইজন্য এই চিঠির টুকরাগুলির মধ্যে সেই ব্যক্তিগত রসটি নাই, চিঠিমাত্রেরই যেটি বিশেষ রস। একটি পূর্ণপ্রস্ফুটিত কমল শতদলে বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্ত-ভাবে ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই ছিন্নপত্র-গুলিরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পত্র সেই নন্দন-গন্ধটুকু বহন করিতেছে বটে, কিন্তু ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে।

কিন্তু না, আমি বোধ হয় ভুল করিতেছি। এ চিঠিগুলি ঠিক ছিন্ন-দলের মতো নয়, কারণ ইহাদের মধ্যে একটি ভাবসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ— দশ বৎসর কালের এই চিঠিগুলি। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান কিছুই অনুভূত হয় না। দশ বৎসরে কত বড়ো বড়ো পরিবর্তন হইয়া যাইতে

পারে, কত রাজ্য-সাম্রাজ্য ভাঙিতে পারে গড়িতে পারে, কত কীর্তি ভূমিসাৎ হইতে পারে, কিন্তু একটি মানুষের নদীর উপরে নৌকাবাসের জীবনে পরিবর্তন নাই। মালার সূত্রে ফুলের পর ফুলের মতো দিনের পর দিন গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে, পূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্যের পায়ে নিবেদনের একটি সাজি সুগন্ধে আমোদিত হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। কী নিবিড়, কী গভীর, কী আশ্চর্য এই মানুষটির অনুভূতি এবং উপভোগ। মনে হয় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য সার্থক যে, একজনও তাহাকে এমন একান্ত আগ্রহে, এমন বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়াছে।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতির এই ভাব-ঐক্য এই ছিন্নপত্রগুলির মাঝখানে সূত্রের মতো থাকায় ইহারা আর এলোমেলোভাবে উড়িতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে এই একটিমাত্র কথা—

'হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি।'

তাহাই 'শেষ কথা' এবং চিরকালের কথা। সোনার ভাবের কালীতে লেখা পরম সুন্দর কথা।

তথাপি এগুলি ছিন্ন করিবার বেদনা আমার মন হইতে মুছিতেছে না। চিঠিকে সাহিত্যের কড়া বাটখারায় ওজন করিয়া তাহার কতটুকু রাখিতে হইবে এবং কতটুকু ছাটিতে হইবে তাহা হিসাব না করিলেই ভালো হয়। কারণ, চিঠি তো আর সাহিত্যের মতো করিয়া লেখা হয় নাই, তাহার অলংকারের অভাবই তাহার সকলের চেয়ে বড়ো মূল্য। অবশ্য চিঠির মধ্যে ব্যক্তিগত অংশ বেশি থাকিলে তাহা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হয় না— কিন্তু এ-সকল চিঠিতে কেহ তো গয়লার হিসাব বা সংসার-খরচের তালিকা প্রত্যাশা করে না। এ তো কাজের চিঠি নয়, ভাবের চিঠি। মানুষকে লেখা হইলেও এ স্থলে মানুষ অনেকটা পরিমাণেই উপলক্ষ। বোধ হয়, বিশ্ব-প্রকৃতি যদি ভাষা জানিত এবং তাহার সঙ্গে মোকাবিলায় আলাপের কোনো সুযোগ থাকিত, তবে এই চিঠিগুলি তাহারই নিকটে প্রেরিত হইত।

সুতরাং এ চিঠিগুলি যেমন ছিল তেমনি বাহির করিলে কী ক্ষতি ছিল!

হিসাব করিয়া দেখি, 'মানসী' 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' যে সময়ের মধ্যে রচিত হইতেছে, 'সাধনা' চলিতেছে, এবং গল্পগুচ্ছ একটির পর একটি করিয়া তৈরি হইতেছে, এই চিঠিগুলি সেই সময়ের। মানসীর সময়ের চিঠি অতি অল্পই আছে, বোধ হয় শ্রীশবাবুর নিকটে লিখিত গোড়াকার চিঠিগুলি বাদে আর বেশি নাই। অধিকাংশ চিঠিই সোনার তরী ও চিত্রা রচনার সময়ের, এবং প্রায়ই শিলাইদহ ও পতিসর হইতে লিখিত। তখন জমিদারি-পরিচালনার কার্যে কবি বোটে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পূর্বে বাংলাদেশের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়-লাভের সুযোগ কবির ঘটে নাই। জীবনস্মৃতিতে দেখি যে, 'সন্ধ্যাসংগীত'-রচনাকালে চন্দননগরের গঙ্গাতীরে এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিবার সময়ে গুজরাট-অঞ্চলে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে বাস ব্যতীত, বিশ্বপ্রকৃতির সহবাস কবির ভাগ্যে বেশি ঘটে নাই। অবশ্য তাহাতে কবির চিত্ত যে উপবাসী হইয়া ছিল এমন নয়— কারণ 'যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যে এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন'— সৌন্দর্য-উপভোগ বাহিরের আয়োজনের উপর নির্ভর করে না। তথাপি মনে হয় যে, এই সময়ে নদী-পথে নৌকায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া বাংলার গ্রাম্যপ্রকৃতি ও গ্রাম্য-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় না লাভ করিলে কবির স্বাভাবিক বিশ্বানুভূতি কখনোই বাস্তব রূপ পাইত না। 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'পুরস্কার', 'বসুন্ধরা', 'জীবনদেবতা' প্রভৃতি যে-সকল কবিতা ভাবে ও প্রকাশে ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ তত্ত্বমাত্র নহে কিন্তু বিচিত্ররূপে ব্যঞ্জনাপূর্ণ, যাহাদের ভিতরকার দৃষ্টি বিশ্বপ্রসারিত, এবং প্রকাশ উপমায় ও রূপে জীবন্ত ও বস্তুগত— আমি তো কখনোই মানিতে রাজি নই যে কবি আপনার ভাবজীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া লইবার এমন অবসর না পাইলে

সে-সকল কবিতায় এরূপ প্রসার, বিচিত্রতা ও সত্যতা কদাচ দেখা যাইত।

সুতরাং আমি দেখিতে পাইতেছি যে, এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই-সকল কবিতাসৃষ্টির ও গল্পসৃষ্টির মূল উৎস পাওয়া যায়। এই-যে নিগূঢ় সৌন্দর্য উপভোগ এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতির সঙ্গে এই-যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, ইহার মধ্যে সেই রসটি রহিয়াছে যে রসে কলম ডুবাইয়া কবি তাঁহার অমর কাব্য ও গল্প -সকল রচিয়াছেন। সুতরাং সে দিক দিয়াও এগুলি পরম আদরের সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপে কালিগ্রাম হইতে লিখিত জানুয়ারি ১৮৯১ তারিখের পত্রখানি লওয়া যায়: 'মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন-কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ-আশঙ্কা-ভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত?' ইত্যাদি। 'যেতে নাহি দিব', 'দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি হে ধরিত্রী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতার ভিতরকার কথা কি এই চিঠির কথার সঙ্গে সায় দেয় না? এমন প্রায় অনেক চিঠিতেই এই সময়কার কোনো-না-কোনো পরিচিত কবিতার সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। শুধু কবিতা নয়, অনেক গল্পের প্লটের ও গদ্যরচনার ইতিহাসও এই চিঠিগুলির মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী ৪ জুলাই ১৮৯১ তারিখের চিঠিতে ধরা পড়িয়াছে, সাজাদপুরের (১৮৯১ জুন) একটি চিঠিতে 'ছুটি' গল্পের ফটিক চক্রবর্তী ছেলেটিকে দেখা গিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, এই চিঠিগুলি সেই কবিতা ও গল্প -রচনার মতোই আর-এক রকমের আত্মপ্রকাশ। সেই-সকল কথাই অন্য আকারে এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

এগুলি পড়িতে পড়িতে একটি জিনিস কেবলই মনে হয় যে, কবির সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তা কী আশ্চর্যরূপে গভীর! কবিতাতে অবশ্য তাহার

পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু চিঠিতে আরো অধিক করিয়া পাইলাম। চিঠিগুলিতে চিন্তার কথা অল্পই আছে— ছাপা পুস্তকের গল্প এখানে-সেখানে উঁকি মারিবামাত্র নিরস্ত হইয়াছে। কেবল এই প্রতিদিনের সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত্রি, মেঘ ঝড় বাদল, নদীর তীর, স্নানের ঘাট, গ্রামের সরল জীবনযাত্রা— ইহার খবর কি দিনের পর দিন দিয়াও তাহা কোনোমতে ফুরাইতে চায়! যে-সকল সংবাদ অন্য লোকের কাছে তুচ্ছ, যাহা চোখ দিয়া দেখিলেও মনের মধ্যে লেশমাত্র রেখাপাত করে না, সেই-সকল সংবাদ এই পত্রগুলি নিত্য বহন করিয়াছে এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে, মানুষের জগতের সকলের চেয়ে বড়ো সংবাদের চেয়ে ইহারা কোনো অংশে ন্যূন নহে। বরং জীবনে এই-সকল স্মৃতির সঞ্চয় অন্য-সকল সঞ্চয়ের চেয়ে মূল্যবান।

ভাবিয়া দেখি প্রকৃতির এমন পরিপূর্ণ উপভোগ আর কোথায় দেখিয়াছি। ওয়ার্ড্স্ওআর্থ্? কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ যেন হিমাচলে ধ্যাননিমগ্ন অন্তুতরঙ্গ শিবের সঙ্গে সেবারতা পার্বতীর সম্বন্ধের মতো। প্রকৃতির সেই গভীরতম প্রাণলোকের সমাহিত ভাবটিই তাঁহার কাছে অধিক চিত্তহারী।

তার পর মনে পড়ে আমিয়েলের জর্নাল। কিন্তু ফিলজফির ভারে আমিয়েল একেবারে ভারাক্রান্ত— ধর্ম সমাজ সভ্যতা প্রভৃতির কত জটিল সমস্যা ও প্রশ্ন লইয়া তিনি ব্যস্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য যদিচ 'পাষাণ-গলা সুধা'র মতো ঝরিয়া পড়িয়াছে, তথাপি এই ছিন্নপত্রের মতো আমিয়েলের ডায়ারিগুলি এমন একটানা প্রবাহ রক্ষা করে নাই। স্থানে স্থানে চিন্তার শৈল আসিয়া সেই সোনার স্রোতের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার পর থোরোর 'ওয়াল্ডেন্'এ প্রকৃতির সহবাসের খানিকটা রস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু থোরোর প্রকৃতিতে বাস আধুনিক সভ্যতার সহিত বিরোধ— তাহা কতকটা রুশো-জাতীয়। এমন স্নিগ্ধ

সরল সুগভীর আনন্দময় বাস নহে।

বরং আমিয়েলের জর্নালের সঙ্গেই ছিন্নপত্রের কতকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ, এই চিঠিগুলিতে যেমন চিত্রের পর চিত্র অঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে, সকলগুলিতেই কবির উপভোগ এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পরিচয় বিদ্যমান—তেমনি আর-একটি ভাবের ও চিন্তার মালা সেই চিত্রমালার সঙ্গেই গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে যাহা আমিয়েলের জর্নালের কথাই বিশেষ-ভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি এই ছিন্নপত্রে এক জায়গায় সেই জর্নাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা আরো বেশি করিয়া খাটে—'এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।··· অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনোটা ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে—কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই—সেইরকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়।'

ছিন্নপত্রও সেইরূপ 'অন্তরঙ্গ বন্ধু'র মতো বলিয়া ইহার স্থানে স্থানে উদ্‌ধৃত করিয়া দেখানো নিষ্প্রয়োজন। এমন-কি, ইহা আগাগোড়া পড়িয়া যাইবারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। যেখানে খুশি সেখানে খুলিয়া পড়া যাইতে পারে। শহরের গোলমালের মধ্যে, নানা কাজের ভিড়ে একটু-খানি অবসর করিয়া লইয়া আমরা এই বইখানির যেখানেই খুলিয়া পড়িব, সেখানেই নিমেষের মধ্যে বাংলার নদীতীরবর্তী গ্রামের সরল সৌন্দর্যের উপর দিয়া সমস্ত মনকে বুলাইয়া লইয়া যাইতে পারিব এবং ভাবের রসে আপনাকে সহজেই রসাইয়া পরম আনন্দ-উপভোগের অধিকারী হইব। চিত্তের সকল ভার ইহা লঘু করিয়া দিতে তিলমাত্র বিলম্ব করিবে না।

১৩১৯

ধর্মসংগীত

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে কবি রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সাহিত্যসমাজ কর্তৃক এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে যে সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আইরিশ কবি য়েট্‌স্ সভাপতি হইয়া রবীন্দ্রনাথের তিনটি ধর্মসংগীতের অনুবাদ পাঠ করেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন। কোন্ তিনটি গানের অনুবাদ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।[১] সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, তাহাদের একটিতে ঈশ্বরকে পথিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; আর একটি মৃত্যুর উপরে, যেখানে মাতৃস্তন হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইবার উপমা আছে। মৃত্যু সেই এক স্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্তনান্তরে মানবশিশুকে পুনরায় আশ্বস্ত করিবার পূর্বে ক্ষণকালীন বেদনা মাত্র— এ ভাবের কবিতা বোধ হয় 'নৈবেদ্যে' আমরা পড়িয়াছি। সুতরাং সম্ভবত গান নয়। পথিকরূপে ঈশ্বরকে দেখা তো বহু স্থানেই আছে, যেমন—

কূজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম—
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

১ কবি য়েট্‌স্ যে তিনটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার একটি গীতাঞ্জলিতে, একটি নৈবেদ্যে ও একটি খেয়াতে আছে। (১) 'শ্রাবণঘনগহন মোহে' (২) 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে' ও 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর' এই দুইটি চতুর্দশপদী কবিতা একত্র। (৩) 'অনাবশ্যক'-নামক খেয়ার একটি কবিতা। এই প্রবন্ধ লিখিবার কালে কবিতা-তিনটির নাম জানা যায় নাই।

য়েট্‌স্‌, টমাস এ কেম্পিসের 'খৃস্টের অনুকরণ' -নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম-পুস্তকের সহিত রবিবাবুর এই-সকল গান ও কবিতার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, 'খৃস্টের অনুকরণ'এর রচয়িতা যেমন পাপবোধের দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া সকল বাহ্য সৌন্দর্যকে ভক্তিসাধনের অন্তরায় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে ভাব আদবেই নাই। তিনি সকল সৌন্দর্যে, সকল ভোগের বস্তুতে ভগবানেরই প্রেমের সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রেমই সৌন্দর্যরূপে কবির কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। আগস্ট মাসের 'মডার্‌ন্‌ রিভিয়ু'তে অ্যাণ্ড্রুজ-সাহেব 'রবীন্দ্রনাথের সহিত এক-সন্ধ্যা-যাপন' নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহাতেও দেখা গেল যে, এক সান্ধ্য সভায় য়েট্‌স্‌ রবিবাবুর এই ধর্মগীতগুলির ইংরেজি গদ্যানুবাদ আবৃত্তি করিবার কালে বলিয়াছেন যে, ভক্তির দিক হইতে এগুলি টমাস এ কেম্পিসের রচনার সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু কবিত্বের দিক হইতে, প্রাকৃত সৌন্দর্যের মধ্যে নিবিষ্টতা ও তন্ময়তার দিক হইতে, ফরাসি-বিপ্লবের সমকালীন কীট্‌স্‌ শেলি ওয়ার্ড্‌স্‌ওআর্থের ভাবনিগূঢ় সৌন্দর্যানুভূতিময় কাব্যের কথা ইহারা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কবি য়েট্‌সের এই অভিমত পাঠ করিয়া, একদা কোনো ভক্তিভাজন ধর্মাচার্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীত সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কী অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই আমার স্মরণে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, যে গান আমাদের অন্তরে দুঃসহ পাপবোধ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা না জাগায় সে গান উপাসনাকে পরিপূর্ণ করিতে পারে না। কবিত্বের ভাষা শ্রুতিমধুর, সৌন্দর্যবোধকে সে তৃপ্তিদান করে বটে— কিন্তু তাহার সেই শরবৎ ঋজুগতি (directness) নাই যাহা একেবারেই গিয়া ঈশ্বরের চরণে উপনীত হয়। আমরা যে কত অকিঞ্চন, কত দীনহীন এবং ঈশ্বরের করুণা যে কী অপার— এই দুই ভাব যুগপৎ যে গানে ব্যক্ত হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্মসংগীত। রবিবাবুর গানে কবিত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু এই

ব্যাকুলতার সুর নাই।

আর একজন ভক্তিমান ব্যক্তি আমায় বলিয়াছিলেন যে, পূর্বেকার গান, যেমন 'বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে', যেমন 'আমি হে তোমারি কৃপার ভিখারি', কিম্বা সেই পূর্বেকার ভাবে অল্পবয়সে রবিবাবু নিজে যে-সকল গান বাঁধিয়াছিলেন— যেমন 'শুনেছে তোমার নাম' বা 'অন্ধজনে দেহো আলো' প্রভৃতি— তাহা তাঁহার আধুনিক গানগুলির চেয়ে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। তাঁহার এখনকার গান কানের উপর দিয়াই ভাসিয়া যায়, হৃদয় পর্যন্ত গিয়া পৌছায় না।

য়েট্‌সের মত এবং ইহাদের মতে যে পার্থক্য দেখা যাইতেছে তাহার ভিতরকার কারণটা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। য়েট্‌স্ যে শুধু কবিত্বের দিক হতে রবিবাবুর ধর্মসংগীতকে ভালো বলিয়াছেন আমার তাহা মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে টমাস এ কেম্পিসের গ্রন্থের সঙ্গে এবং প্রাচীন হিব্রু ঋষিদের ভক্তিগাথার সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের এ-সকল গান ও কবিতার তুলনাই উত্থাপন করিতেন না। পক্ষান্তরে যে ধর্মাচার্যের কথা বলিলাম তিনি একজন ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধক— তাঁহার হৃদয়কে যখন রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ধর্মসংগীতগুলি ভরিয়া দেয় নাই তখন তাহার কারণটা কী তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা এ সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ সত্যবিচারে গিয়া পৌছিতে পারিব বলিয়া ভরসা হয়।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উপাসনার সময় পুনঃপুনঃ শুনিতে শুনিতে ভাবের অনুবদ্ধিতাসূত্রে যে-সকল গান জড়িত হইয়া যায় সেগুলি কবিত্বহিসাবে উৎকৃষ্ট না হইলেও সাধকের মন সহজেই অধিকার করে। ইউরোপে ধর্মসংগীত এইজন্য এক বিশেষ ধরনের হয়— তাহার সুর কথা ভাব অত্যন্ত সাধারণ হইলেও বহুদিন ধরিয়া তাহার সঙ্গে মানুষ পরিচিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া গাহিবামাত্রই হৃদয়কে স্পর্শ করিতে তাহা তিল-মাত্রও বিলম্ব করে না। তাহার স্থানে কোনো কবির রচিত খুব চমৎকার

গান গাহিলে গির্জায় অধিকাংশ লোকের কখনোই ভালো লাগিবে না।

কিন্তু ইউরোপে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, সেখানকার ধর্মসংগীত শুধু কেন, ধর্মসম্বন্ধীয় সকলপ্রকারের আলোচনাই বড়ো বেশি প্রথাগত সংস্কারগত ও স্থূলধারণাপূর্ণ হইয়াছে। সেখানকার অধিকাংশ ধর্মসংগীতের বন্দনীয় ভগবান জিহোভা হইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম হন নাই। তাঁহার শক্তি প্রতাপ ন্যায়দণ্ড করুণা প্রভৃতি সকলপ্রকার ভাবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল রূপকের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেইজন্য পশ্চিমের ধর্মসংগীত শুনিলে হৃদয়ে একপ্রকার ভক্তিরস জাগে বটে, পাপবোধ উগ্র হয় এবং ঈশ্বরের করুণা ও ক্ষমার জন্য ব্যাকুলতার উদ্রেক হয়, কিন্তু আমাদের অন্তরস্থিত তত্ত্বজ্ঞানী মন তৃপ্ত হয় না। সে মাথা নাড়িয়া বলে— উঁহু, এ-সকল ভাবোচ্ছ্বাস সত্যপ্রতিষ্ঠ নয়।

ইউরোপের ন্যায় আমাদের দেশে কোনো উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ঐরূপ তত্ত্বাধারশূন্য ভাবুকতাপূর্ণ সম্প্রদায়ের ধর্মগীত-প্রচলনের কোনো কারণ দেখি না, কারণ আমাদের দেশে অধ্যাত্মসাধনা তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াছে; পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান অধ্যাত্মসাধনার ভিতর হইতে সারসংগ্রহ করিয়াছে— দোঁহে দোঁহার অবলম্বন। উপনিষদকেই বলে বেদান্ত ও শ্রেষ্ঠবিদ্যা, তাহারই উপর ভর করিয়া সকল তত্ত্বশাস্ত্র ভারতবর্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ তাহাকে সাধকের গভীরতম অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অপূর্ব প্রকাশ করিয়া চিরদিনই ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। ভগবদ্গীতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই সেই এক কথা— তাহা হইতে এক ধারা গিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে, অন্য ধারা গিয়াছে কাব্য ও সংগীতের দিকে। এই উভয় ধারাই ভারতবর্ষে চিরকাল পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মসংগীতগুলি ইউরোপের ধর্মসংগীতের ন্যায় অকবিদের দ্বারা রচিত নহে। তাহা তত্ত্বদর্শী সাধক কবিদিগের রচনা।

তথাপি প্রবন্ধারম্ভে যাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছি সেই ভক্তিভাজন ধর্মাচার্য, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গীতগুলি উপাসনাকে পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে এ কথা বলিলেন কেন? রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার ধর্মসংগীতগুলি প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোনো অধ্যাত্ম-অনুভূতি জাগে নাই— তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপনি বাণী-রূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আধুনিক গানগুলি যে তাঁহার কাব্যজীবনেরই চরম পরিণতি-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা তো প্রথাগত নহে, আত্মগত— দশের জিনিস নহে, একলার। তাহা হউক, ইহারা যে সত্য সে বিষয়ে তো সন্দেহ নাই। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথাগত জিনিস স্বাধীন স্বকীয় জিনিসের চেয়ে চিত্তকে অধিক আকর্ষণ করিবে, এ কথার অর্থ কী? সেই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

এই আমি যে বসিয়া লিখিতেছি, আমার সম্মুখে বর্ষার জলসিক্ত কাননে কত শুভ্র ফুলই ফুটিয়াছে দেখিতেছি। যেন শ্যামদুকূল-পরা ছোটো ছোটো বনকন্যাদের কপালে কেহ শ্বেতচন্দনের টিপ পরাইয়া দিয়াছে। আমি দেখিতেছি, ঐ প্রত্যেকটি পুষ্প যে তরুতে ফুটিয়াছে সেই সমস্ত তরুটিরই সে প্রতিমা। উহার দণ্ডটি তরুকাণ্ডেরই মতো, উহার দলে দলে কত শিরা-উপশিরা ডালপালার মতো কত সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। দলরাজি আবার পল্লবগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া কোথা হইতে এক আশ্চর্য সৌরভ এবং বর্ণ লাভ করিয়াছে এবং আপনাদিগকে বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কোন্ একটি ভাবী সফলতার বীজকোষকে গর্ভের মধ্যে আবৃত করিয়া একটির সঙ্গে একটি কেমন এক সুন্দর বন্ধনে মিলিত হইয়াছে! জীবনের মধ্যে ধর্মের প্রকাশও কি ঠিক এইরূপ নয়? সমস্ত জীবনের হাসি-কান্না ভোগ চপলতা হইতে ধর্ম স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য কি বিচ্ছেদের স্বাতন্ত্র্য না পরিণামের স্বাতন্ত্র্য? আমার সমস্ত জীবন ভরিয়া আমি প্রকৃতির

কত সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি, কত নরনারীর প্রণয়বন্ধনে কত হাসি-কান্নার ভিতর দিয়া যাইতেছি, আমার কর্মপ্রবৃত্তি আমাকে দিয়া কত কী করাইতেছে, কত কল্যাণ ও অকল্যাণের সৃষ্টি করিয়া জয়পরাজয়ের মধ্য দিয়া আমায় ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই-সমস্ত অভিজ্ঞতার উপর, অনুভাবের উপর আমার ভাবনা আমার কল্পনা কত রঙ মিশাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান কত গভীরতর মূলে ইহাদের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করিতেছে। এই-যে দেখিতেছি আমার জীবনের লীলা— আমার ধর্মবোধ কি এই লীলার অন্তর্গত নয়? সে কি ইহাকে এক পাশে সরাইয়া দিয়া তবে প্রকাশ পাইবে? সে কি এই বিচিত্র ডালপালাময় জীবনতরুটিরই শাখাগ্রভাগে ফুলের মতো ফুটিবে না? এই সমস্তকেই রূপান্তরিত করিয়া ভগবৎপ্রসাদের একটি সুগন্ধ হিল্লোল এবং নানা রঙের এক আনন্দতরঙ্গ বহাইবে না?

অনেকেই জীবন হইতে ধর্মের স্বাতন্ত্র্যকে এইরূপ পরিণামের স্বাতন্ত্র্য-রূপ দেখেন না, কিন্তু বিচ্ছেদের স্বাতন্ত্র্যরূপেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মুখে যতই অস্বীকার করুন, তাঁহারা সমস্ত জীবনের গান শুনিতে এবং শুনাইতে ভয় পান এবং জীবনটাকে অত্যন্ত কৃশমলিন, অত্যন্ত পাপজীর্ণ কল্পনা করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াও থাকেন। জীবনের বিচিত্র রাগ— সৌন্দর্যবোধের রাগ, মাধুর্যের রাগ, কল্যাণের রাগ, কল্পনার রাগ, ভাবের রাগ— এ-সমস্ত রাগ এবং রাগিণীর কোনো সার্থকতা তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহারা রাগবর্জিত রসবর্জিত নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মতো, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়ের মতো তাঁহাদের কাছে ভালো এবং মন্দ একেবারে সুনির্দিষ্ট। কারণ, কী যে ভালো এবং কী যে মন্দ তাহা কিনা কতকগুলি বাঁধা বাহিরের নিয়মের উপরই নির্ভর করে। জীবনের অভিব্যক্তিতে বাঁধা ভালো যে দেখিতে দেখিতে কোন্ মন্দের মুক্তক্ষেত্রে একেবারে মত্ত অশ্বের মতো রাশ-আলগা হইয়া ছুটিয়া যায় এবং মন্দও যে কী বিচিত্র উপায়ে ভালো হইয়া উঠে,

মনুষ্যপ্রকৃতির এ-সকল নিগূঢ় গুহাগতির মধ্যে তাঁহারা কোনোদিনই প্রবেশ করেন না। এ কথা মনেও আনেন না যে, প্রবৃত্তির ঝড় মানুষের মধ্যে অনিবার্যরূপেই জাগে, কিন্তু তাহারই ভিতর দিয়াই তো ভোগ-বিরত অচঞ্চল শান্তির মধ্যে মানুষ আবার উত্তীর্ণ হয়। পঙ্ককে দেখিয়া পঙ্কজকে নিন্দা করে সেই, যে মূর্খ— কারণ, যে আকাশে পঙ্ককে উদ্ভেদ করিয়া পঙ্কজ মাথা তোলে তাহা উজ্জ্বল নির্মল আকাশ, সেইখানেই সে আপনার সমস্ত সুরভিকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দেয়।

পাপবোধ ধর্মকে সেই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবারই বোধ, জীবনকে ফুলে ফলে বিকশিত করিবার বোধ নয়। অবশ্য ধর্মজীবনে তাহার কোনো স্থান নাই এতবড়ো দুঃসাহসিকের কথা কোন্ মুখে বলিব, কিন্তু সে স্থান কেমনতর? এই বর্ষার পূর্বে যেমন উত্তপ্ত মাটি-ফাটা গ্রীষ্ম গিয়াছে, তাহারই মতো। গ্রীষ্মের শোষণই যে বর্ষার মেঘকে জন্মদান করিয়াছে। গ্রীষ্মের ঝড়ই যে তাহাকে দিগ্‌দিগন্তে চালিত করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, গ্রীষ্মের তাপ মাটির আগাছা পরগাছাকে শুকাইয়া, মাটির সমস্ত দূষিত বীজকে দগ্ধ করিয়া ভূমিকে ফলধারণযোগ্য করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই গ্রীষ্মের পরিণামই যে বর্ষা, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও যেমন সে কথা আমাদের অত্যন্ত জানা, তেমনি পাপবোধের শোষণ ও দাহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আনন্দ না জাগে, যদি না জানি যে এই জীবনের উপর আমার ফুল ফুটিবে, গন্ধ ছুটিবে, বর্ণ ধরিবে, মধুমক্ষিকার মেলা বসিবে, তবে তো মারা গেলাম! তবে যে দাহ দাহই থাকিল, বর্ষণের মেঘকে সে তৈরি করিল কোথায়? বৈরাগ্য এবং রাগ, পাপের দাহ এবং সান্ত্বনার সুধা একই সময়ে আসা চাই, তবেই প্রাণ বাঁচে। নহিলে সমস্তই কী ভয়ংকর কালো, কী শূন্য, কী অন্ধকারময়!

শুধু 'না'র দিক দিয়া মানুষের কোনো ভালো করা যায় না— 'হাঁ' চাই। খৃস্টধর্ম এখন যে পরিবর্তনের দিকে চলিয়াছে তাহাতে সে এই 'হাঁ'র দিকটাকেই বড়ো করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু তাহার

ইতিহাসে বরাবরই এই ভাবাত্মক দিকটার অভাব থাকিয়া গিয়াছিল। সে 'প্রেমে মুক্তি' বলিয়াছে, কিন্তু সেই প্রেমটার প্রকাশ সমস্ত জীবনের মধ্যে যে কিরকম তাহার কোনো আভাস দেয় নাই। ব্রাউনিং প্রভৃতি আধুনিক কবির কাব্যের মধ্যে বরং খানিকটা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তাঁহারা 'না'কে একেবারে অস্বীকার করিয়া জীবনের ভিতর হইতে ধর্মের ফুলকে ফুটাইয়াছেন— সমস্তকেই 'হাঁ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'Everlasting Yea'— চিরন্তন হাঁ। সেইজন্য ব্রাউনিঙের মধ্যে পাপ-বোধ যথেষ্ট নাই এমন অপবাদও কেহ কেহ দিতে ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ খৃস্টধর্ম লইয়া তুমুল আন্দোলনাদির মধ্যে এই কথাটাই সত্য যে, খৃস্টধর্মের সঙ্গে খৃস্টান মানুষের আজিও পুরা বনিবনাও হয় নাই। সে মানুষ জীবনের সম্ভোগে ভরপুর, আর তাহার ধর্ম জীবনের আনন্দকে, সৌন্দর্যভোগকে ডরাইয়া চলে। এই কারণে সে মানুষের মধ্যে ধর্ম এখনো প্রতি দিনের, প্রতি কাজের, প্রতি নিশ্বাসপ্রশ্বাসের, অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। সে অনেকটা পরিমাণে রবিবারের এবং গির্জার জিনিস হইয়া আছে। অবশ্য সাহিত্য এবং শিল্প তাহাকে ক্রমাগত জীবনের ভিতরের দিক হইতে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য সাধনায় রত রহিয়াছে।

আমার বিশ্বাস যে, কবিরাই জীবনের সঙ্গে ধর্মের বিচ্ছেদকে ঘুচাইয়া দেন। তাঁহারাই জীবনের সঙ্গে ধর্মের স্বাতন্ত্র্যকে ঐ পরিণামের স্বাতন্ত্র্য-রূপে দেখান। তাঁহাদের চাপো আর মারো আর গাল দাও— জীবনের আনন্দকে বাদ দিয়া বৈরাগ্য প্রচার করিতে তাঁহারা কোনোমতেই পারিবেন না।—

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কী চপলতা !
কেন হাস্যপরিহাস, প্রণয়ের কথা !

কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে!
দিয়াছি উত্তর তারে, ওগো পক্ককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ!
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বীণায়
দিয়াছেন তারি সুর, সে তাঁহারি দান;
সাধ্য নাহি নষ্ট করি সে বিচিত্র গান!

ইহারই জুড়ি কবিতা ব্রাউনিঙের 'ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি'। ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি এক মধ্যযুগীয় চিত্রকর। তিনি সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এক মঠে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অনুমতিক্রমে কেবল স্বর্গের দেবদূত পরী এবং অন্যান্য কাল্পনিক ছবি না আঁকিয়া মধ্যে মধ্যে জীবনের আনন্দে রাজপথের জীবন্ত নরনারীদের ছবি আঁকিয়া ফেলিতেন এবং মঠের পক্ককেশ সন্ন্যাসীদের এই উত্তরই দিতেন—

আমার তুলিতে সাজে তাঁহারি আদেশ।

আমাদের ভারতবর্ষে জীবনের সঙ্গে ধর্মের যে তেমনতর বিচ্ছেদ ঘটে নাই তাহারও প্রধান কারণ আমার এই মনে হয় যে, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অনেক ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ একাধারে কবি এবং সাধক ছিলেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম এবং তাহার অবসানকালে শক্তিপূজা যথেষ্টপরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিলেও বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্লাবনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। বাংলা গীতসাহিত্যে বৈষ্ণবই একা রাজত্ব করিতেছে।

বৈদিক ঋষিরা কবি, উপনিষদ্‌কারগণ কবি, কবীর নানক দাদূ অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর কবি— সুতরাং কেমন করিয়া আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্য রূপরসের দাবিকে অগ্রাহ্য করিবে, বিশ্বসৌন্দর্যকে নির্বাসনদণ্ড দিবে?

ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসেও খৃস্টধর্মের প্রভাবে এক সময়ে পাপবোধ সকল রস ও সৌন্দর্য হইতে ধর্মকে সরাইয়া লইয়া অত্যন্ত একদেশবর্তী শুষ্ক এক পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এখানেও এক মহাকবির গান সেই ধর্মকে সেই একদেশের অতিপ্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে ভারতের চিরন্তন রসসাধনা ভক্তিসাধনার ধারার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতেছে।

ম্যাক্‌লিফ-সাহেব শিখধর্ম-নামক তাহার রচিত গ্রন্থে গুরু নানকের যে-সকল ভজন সংগ্রহ করিয়া ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং ক্ষিতিমোহনবাবু ওয়েস্ট্‌কট প্রভৃতির উপর নির্ভর না করিয়া কবীরের যে বাক্যাবলী মূল হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে একটি কথা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতের সঙ্গে এই ধর্মবাক্যগুলি ভাবে রসে প্রকাশে, এমন-কি অনেক সময় উপমা-অলংকারের সাদৃশ্যেও, এক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

কবীর কহেন, তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনকে খুঁজিয়া পাইবে না, তেমনি তিনি বিচ্ছিন্নভাবে মিলিবেন না।

কহৈঁ কবীর বিছুড় নহিঁ মিলিহো
জ্যো তরবর ছোড় বনমাধরী—

ঐ একই কথা!

কবীর নানক প্রভৃতি ভক্তদের গান পাপবোধের দ্বারা আক্রান্ত নয়। আমারই ভিতর সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমারই জীবনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য অবাধে ফুটিতেছে— তাঁহাদের গান এই আনন্দের সুরে বাঁধা।

য়া ঘট ভীতর চন্দ্রসূর হৈ য়াহী মে নৌলখতারা— আমারই মধ্যে চন্দ্রসূর্য, আমারই মধ্যে নব লক্ষ তারা প্রকাশিত। —কবীর

আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে। —রবীন্দ্রনাথ

যাবহী মূরত বীচ অমূরত, মূরতকী বলিহারী— সকল মূর্তিরই মধ্যে অমূর্ত ; বলিহারি যাই সকল মূর্তির। —কবীর

আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি। —রবীন্দ্রনাথ

এইরূপে দেখা যাইবে যে ইহাদের গানের ভিতরকার তত্ত্বটিই এই যে, বিশ্বকে কোথাও বাদ দেওয়া নয়, রূপকে কোথাও অস্বীকার করা নয়, কিন্তু আত্মার আনন্দের দ্বারা সমস্তকে পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করা। আশ্চর্য ইহাদের উপলব্ধি, পরিপূর্ণ ইহাদের আনন্দোদ্‌বোধন এবং রসানুভূতি— এমন আশ্চর্য ভক্তিকবিতা কোনো দেশে আছে কি না সন্দেহ।

কবি য়েট্‌স্ কেন, ইউরোপীয় কোনো ভাবুকই আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে এই মধুর উৎসটির সংবাদ পান নাই। তাঁহারা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের সংগীত পাইয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং এক নূতন জ্যোতিষ্ক-আবিষ্কারের যেমন আনন্দ তেমনি এক আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু যে মানিক তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে সে যে, একটি আধটি নয়, ভারতবর্ষের ভাবসমুদ্রের তলায় সে যে কত যুগযুগান্তর হইতে কত বিচিত্র রূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, সে খবর যেদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে সেদিন বিশ্বসাহিত্যের ঐকতানসংগীতে এক নূতন সুরের আবির্ভাব ঘটিবে। হয়তো ঐকতানসংগীত যাহার অভাবে সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না সেই সব-মেলানো সব-বেসুর-ডোবানো সুরই আসিয়া সকল বিচ্ছিন্ন গীতকে মিলিত করিয়া সকল মানবকে এক আনন্দসভায় আহ্বান করিবে। সেদিন দূরে নাই। বিবাহের প্রথম বাঁশিটি বাজিয়াছে— ঐ একটি সানাইয়ের করুণমধুর রাগিণী। পূর্বগগনকে

প্লাবিত করিয়া, এখন জীবনের সায়াহ্নে পশ্চিমগগনের বিজয়গৌরবচ্ছটাকে সে সুধাস্নিগ্ধ করিতে গিয়াছে। রাত্রি আসন্ন, আবার অরুণোদয়ের অপেক্ষায় সবাই বসিয়া আছে, এ অরুণোদয়ে সমস্ত মানুষের সম্মিলিত জাগরণ, ইতিমধ্যে : Watchman, what of the night ?

১৩১৯

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি পশ্চিমের সাহিত্যের অরণ্যে দাবানলের মতো গিয়া পড়িয়াছে, এ সংবাদ যখন আমরা প্রথম পাই তখন এই ঘটনার আকস্মিকতা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই, সুতরাং তাহাকে লইয়া এতটা মাতামাতির ব্যাপার কেন হইল, তাহার কারণটা আমরা ঠিকমত বাহির করিতে পারি নাই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি যে কেবলমাত্র বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহা জানিতেন না। তাহাতে পাঁচ সাজির ফুল একত্র করা হইয়াছিল। নৈবেদ্যের অনেক ভালো ভালো কবিতা, খেয়ার বহু কবিতা, গীতাঞ্জলির গান এবং গীতিমাল্যেরও প্রায় পনেরো-ষোলোটি গানের অনুবাদ ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজি গীতাঞ্জলি একপ্রকার রবিবাবুর শেষ বয়সের কবিতার কষ্টিপাথর।

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন অক্‌স্‌ফোর্ডে বন্ধুজনসভায় রবিবাবুর গোটাকতক বাছা বাছা কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে তখন রবিবাবুর নিজ কাব্যের অনুবাদচেষ্টা অসম্ভবের রাজ্যে বাষ্প মুড়ি দিয়া নিদ্রিত ছিল— সে যে সম্ভবের দেশে কোনোদিন পক্ষবিস্তার করিবে, এমন স্বপ্নও কেহ দেখে নাই। আমি তাই নিশ্চিন্তমনে একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলাম। আমার রচনার সৌষ্ঠব বা কলাচাতুর্য— ভাষার মাধুর্য বা বিশুদ্ধি— উৎকৃষ্ট কি মাঝারি কি নিকৃষ্ট, সে দিকে কেহ লক্ষমাত্র করিল না। আমি বাংলাকাব্যের পরিচয়বহনকার্যে সেই পাদপহীন দেশে স্বচ্ছন্দে দ্রুম বলিয়া চলিয়া গেলাম।

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালির অনেকগুলি কবিতার সঙ্গে গোটা

দুই-তিন মাত্র নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। আমার দু-একজন বন্ধু নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতাগুলিকেই সর্বোত্তম বলাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন, 'প্রেমের কবিতা আমাদের দেশে এত জমিয়াছে যে, পাঠকেরা আর তাহাতে স্বাদ পায় না। টেনিসন, ব্রাউনিং, জর্জ এলিয়ট প্রভৃতির 'বস্তুতন্ত্র' সাহিত্যেও জগৎটা এমনি গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার 'মায়া' যেন সূর্যাস্তে মেঘের চতুর্দিকের চঞ্চল বর্ণচ্ছটার মতো আর হিল্লোলিত হইয়া বেড়ায় না —সব যেন বড্ড স্পষ্ট, বড্ড নিরেট, বড্ড বেশি গোচর। আমরা তাই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের মোহাঞ্জন চোখে পরিতে চাই; সেই অঞ্জন পরিয়া জগৎকে, মানুষকে, মানুষের প্রেমকে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। য়েট্‌স্ প্রভৃতি কেল্‌টিক অভ্যুত্থানের কবিদল, ফ্রান্সিস টম্প্‌সন, জন মেস্‌ফিল্ড্‌ প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবিগণ সেই অঞ্জন চোখে মাখাইয়াছেন বলিয়া পাঠকেরা তাঁহাদের আদর করে। নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতার মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনির্বচনীয় রস আছে— রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায় সে রস নাই।'

কথাটা তখন আমার মনে লাগিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক ইংরেজি কাব্যের সহিত আমার পরিচয় যথেষ্ট ছিল না বলিয়া আমি ভালো করিয়া কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। য়েট্‌সের কাব্য লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। য়েট্‌সের কাব্যের মধ্যে বিশেষত্ব যে কী তাহা বুঝিলাম না। প্রাচীন কেল্‌ট্ পুরাণকাহিনীকে ছন্দোবদ্ধ করাতেই যদি কোনো বিশেষ বাহাদুরি থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। ইংলণ্ডে সবাই বলিত, য়েট্‌স্ একজন অসাধারণ মিষ্টিক। যাহা-কিছু দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালি তাহাকেই মিষ্টিক আখ্যা দেওয়া হয়, ইহাই জানিতাম। এখনকার কালের সাহিত্যে হঠাৎ যে দক্ষিনে হাওয়া মাধবীবনে পুষ্পবিকাশ বন্ধ করিয়া, পুবদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া পুবে হাওয়া হইয়া আকাশকে রহস্যগম্ভীর জলদজালে ঘেরিয়া

ফেলিয়াছে, সে খবর কে জানিত। ইউরোপের ইতিহাসে পড়িয়াছি, মধ্যযুগকে বলিত Dark Ages—অন্ধকারের যুগ। সেই অন্ধকারের খনি খুঁড়িয়া যে রাশি রাশি মধ্যযুগের ভক্ত সাধক ও কবিদের মণিমালা গাঁথিয়া তুলিবার প্রভূত আয়োজন চলিতেছে, তাহাই বা কে জানিত! সেন্ট্ ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি, ম্যাডাম গেঁয়ো, রিচার্ড্ রোলে, জুলিয়ান অব নরউইচ, ক্যাথারিন ডি সায়েনা ইত্যাদি ভক্তদের নামই লোকে ভুলিয়াছিল। এ ছাড়া কোথায় পারসিক, কোথায় ভারতবর্ষীয়, কোথায় চৈন—সকল দেশের মিষ্টিকদের যে তলব পড়িয়াছে, এ দেশে বসিয়া শেক্স্পীয়র বার্ক্ টেনিসন পড়িয়া পরীক্ষা পাস করিবার উদ্যোগে সে-সব সংবাদের কিছুই আমাদের কাছে আসিয়া হাজির হয় নাই। পশ্চিমের লোকেরা জানে যে, মহাভারতের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্লোক এবং রামায়ণের আটচল্লিশ হাজার শ্লোক এবং যত রাজ্যের অসম্ভব অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পই হিন্দুসাহিত্য—কেবল উপমা অনুপ্রাস ও অলংকারের ঘটা—শব্দের চাতুর্য এবং তত্ত্বের কচ্কচি তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, আপাদমস্তক-গহনামণ্ডিত দেহের মতো, তাহার গড়ন যে কেমন, সৌন্দর্য যে কেমন, তাহা বুঝিবারই জো নাই। আমরাও তেমনি জানি যে, পশ্চিমের সাহিত্য মানে সেই শেক্স্পীয়র এবং টেনিসন এবং তাহাদের সমালোচকবর্গ। পশ্চিমের লোকেরা যখন আমাদের গালি দেয় যে, তোমাদের কলাবোধ নাই, আমরা পাল্টা জবাব দিই যে, 'ও বোধটা তোমাদের জন্য কায়েম করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা তো তত্ত্বের ধার ধার' না, ঐ বস্তুর বোধ ভিন্ন আর কোন্ বোধ তোমাদের জন্মিবে বলো?'

যাহাই হউক, আমাদের অজ্ঞাতসারে বিধাতাপুরুষের গোপন দূতেরা হাওয়ার মুখে পশ্চিমের শিল্পসাহিত্য হইতে কলাসৌষ্ঠববোধের বীজ এ দেশে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং পূর্বদেশের ভারী ভারী তত্ত্বের বীজ ও সাধনার বীজ ও দেশে লইয়া যাইতেছিল। কেবল আমাদের সঙ্গে পশ্চিমের

প্রভেদ ছিল এই যে, আমাদিগকে যে কারণেই হউক বাধ্য হইয়া পশ্চিমের সাহিত্য পড়িতে হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে সেই সাহিত্য হইতে রস আদায় করিয়া আমাদের নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গে তাহার একটা সজীব সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও হইয়াছিল। এইরূপে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে যে আহার পাইয়াছিলাম তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু বিদেশীরা আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; শুধু জানিত এই যে, হিন্দুসাহিত্যে অনাবশ্যক মাল মসলা এতই অধিক যে তাহার মধ্য হইতে রস আদায় করা বিষম শক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের উপমার আড়ম্বরের এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুপ্রাসের ঘটার যেটুকু রস পশ্চিমীরা চাখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত হইয়াছিল।

সকলেই জানেন যে, ইংরেজি গীতাঞ্জলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন, তাহা যে এক মুহূর্তেই ইংরেজ পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল তাহা কেবল ভাবের সৌন্দর্যের জোরে নয়, ভাষার ও রচনার আশ্চর্য কলাসৌষ্ঠবের জোরে।

Have you | not heard | his si | lent steps ?
He comes, | comes, | ever comes |

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি?
সে যে আসে, আসে, আসে।

গদ্যানুবাদে ছন্দের এমন দোল ইতিপূর্বে ইংরেজি সাহিত্যে কাহারো রচনায় প্রকাশ পায় নাই। হুইট্‌ম্যান মিল বাদ দিয়া গদ্যে কাব্যরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে গদ্যই হইয়াছে, কাব্যের ভাষার ললিত নৃত্যগতি সে গদ্যে জাগে নাই। এড্‌ওআর্ড্‌ কার্পেণ্টার Towards

Democracy -নামক গ্রন্থে সেই একই প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু তিনি হুইট্‌ম্যানী ধাচার ভাষা ও ভঙ্গিমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন— তাঁহার গদ্যের একটানা প্রবাহে ছন্দের তরঙ্গদোললীলা জমে নাই। সেইজন্য গীতাঞ্জলির ছন্দযুক্ত গদ্যের তুলনা খুঁজিতে গিয়া ইংরেজ সমালোচকবর্গকে হিব্রু সামগাথার (Psalms) কথা পাড়িতে হইয়াছে।

তার পর শুধু ছন্দ নয়, শুধু ভাষার শিল্পচাতুর্য নয়, এ কবিতায় প্রাচ্যদেশসুলভ অলংকারবাহুল্য পশ্চিমবাসীগণ একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বাণীতে যে অলংকার সাজে না, কারণ—

অলংকার যে মাঝে প'ড়ে মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর ঝংকার।

সে কথাটি হয়তো ও দেশের লোকেরা ভালো করিয়া ভাবে নাই। অলংকার অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বাণীর গভীরতাকে ঢাকুক বা না ঢাকুক, সে যে কবিতার কলাসৌষ্ঠবকে নষ্ট করে, ইহাই তাহার বিরুদ্ধে সকলের চেয়ে প্রবল অভিযোগ। অতএব এই নিরাভরণ সরল কবিতার বিরল সৌষ্ঠব পশ্চিমের রসগ্রাহীদিগের মনকে এক মুহূর্তে অধিকার করিয়াছিল।

অলংকার বাদ দিয়া একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া কলামূর্তি গড়িবার সাধনা এখনকার কবিদের একটি প্রধান সাধন। একাল যে আবরণ মোচন করিবার কাল— বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারের একটি একটি করিয়া আবরণ খসাইয়া সমাজকে, মানুষকে, মানুষের সম্বন্ধগুলিকে, বিশ্বজগৎকে একেবারে তাহার যথাযথ মর্মস্থানে দেখিবার জন্য একালের মানুষের মন যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্য হইতেই প্রচুর পাওয়া যায়। হেন্‌রিক ইব্‌সেন, মেটার্‌লিঙ্ক্‌, বার্নার্ড্‌ শ, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌, হাউপ্‌ট্‌-ম্যান, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের যে-কোনো রচনা পড়িলেই দেখা যাইবে যে, হয় সমাজের কোনো পাকাপোক্ত সংস্কারের পর্দা তুলিয়া

সমাজের ভিতরকার জীবননাট্যলীলাকে তাঁহারা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন, নয় স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-ঘটিত সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কোনো-না-কোনো জায়গায় তাঁহাদের আঘাত আবরণ ছিন্ন করিবার জন্য উদ্যত। সাহিত্যের এই ভিতরের চেষ্টা বাহিরের নিরাভরণ ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সাহিত্যরচনার কোনো আলংকারিক প্রথা বা নিয়ম (conventions) একালের সাহিত্যিকেরা মানেন না। সেইজন্য তাঁহাদের রচনা সময়ে সময়ে এত নেড়া হইয়া পড়ে যে, পড়িয়া কোনো রসই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার প্রধান কারণ, তাঁহারা অনেকেই নিজেদের সম্বন্ধে অতিসচেতন। আমি একটা কিছু বলিতেছি, আমি এমন করিয়া লিখিয়া থাকি, আমি ভাষার বা সাহিত্যিক প্রথাপদ্ধতির ভারী একটা বদল করিয়া দিতেছি— এ কথা কোনো কবি বা সাহিত্যিক লিখিবার সময়ে ভাবিলেই তাঁহার রচনা কখনোই সরলতার মাধুর্যে ভরিয়া উঠিবে না। অবলীলাক্রমে যে কাজটি হয় তাহাতেই সৌন্দর্য ফোটে। যে গায়ক গানের প্রত্যেক তালটিতে লয়টিতে তানটিতে অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দেয়, অর্থাৎ সে সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার গানের মাধুর্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এইজন্য আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যখন ভাবের প্রেরণার হাতে কবিরা আপনাদিগকে সমর্পণ করেন তখনই তাঁহাদের সংগীত ফুলের মতো রঙে ও গন্ধে পূর্ণ হইয়া ফোটে, ঢেউয়ের মতো কলক্রন্দনে বাজিতে থাকে, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য সকল আনন্দের সঙ্গে একাসন গ্রহণ করে। ইউরোপে আধুনিক কালে একজন কবিও নাই, যিনি এমনি আত্মভোলা সরল। সেই কারণে তাঁহাদিগকে বলিতে হয় এবং তাঁহারাই আপনাদিগকে বলিতে শুরু করিয়াছেন—

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

যতই বলিস যতই করিস
যতই তারে তুলে ধরিস
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করিস বোঁটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

তাঁহাদের কাব্যরচনা ঐ বোঁটায় আঘাত করা মাত্র, আলংকারিক প্রথাকে ভাঙিবার প্রয়াস মাত্র— কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে কোথায়? সেই ফুল ফুটিয়াছে গীতাঞ্জলিতে। সেইজন্য তাহার বাহ্য সৌষ্ঠবেই ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের মন সর্বপ্রথমে ভুলিয়াছিল।

২

আমি বলিয়াছি যে, দ্রাক্ষা হইতে মদ চোলাইয়া লইবার মতো বাস্তব সাহিত্য নিঙ্‌ড়াইয়া যেটুকু রস আদায় করিবার তাহা পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া অবশেষে পশ্চিমের সাহিত্যের রসপাত্র রিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্যয়্‌টে, ওয়ার্ড্‌স্‌ওআর্থ্‌, কীট্‌স্‌, টেনিসন প্রভৃতি কবিদিগের কাব্যে এখনকার কালের মানুষের মন আর রস পাইতেছিল না। এখন নূতন সাকীর প্রয়োজন। বাস্তবলোকের রসাস্বাদন তো হইল, এবার অতীন্দ্রিয়-লোকের মধু যে কেমনতর তাহা আস্বাদন করা চাই। একদল নূতন সাকী অত্যন্ত আভরণহীন, ছায়ার মতো না-যায়-ধরা না-যায় ছোঁওয়া গোছের আধারে সেই 'নন্দনবনমধু' ভরিয়া আনিলেন এবং রসপিপাসুদিগকে বিতরণ করিলেন। য়েট্‌স্‌ প্রভৃতি কেল্‌টিক অভ্যুত্থানের কবিগণ ফ্রান্সিস টম্প্‌সন প্রভৃতি 'মিস্টিক'এর দল মিষ্ট রস পরিবেশনে আসর জমকাইয়া পুরাতন সাকীদিগের রসভাণ্ডারে একেবারেই কুলুপ লাগাইয়া দিলেন। এখন হইতে অতীন্দ্রিয়লোক এবং বাস্তবলোকের মধ্যে যে পর্দা ছিল

তাহা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উড়িতে লাগিল। কবির সেই ক্ষণিকার 'এক গাঁয়ে' কবিতার মতো এই দুই লোকের মধ্যে রহস্যলীলা চলিতে লাগিল মন্দ না।—

তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

সেখানকার হাওয়া আসিয়া এখানকার পুষ্প ফোটায়, সেখানকার পরীদের গান এখানকার বনমর্মরে নদীনির্ঝরে শোনা যায় এবং নবীন সাকী সেই গান শুনিয়া গাহিয়া ওঠেন—

Fairies, come, take me out of this dull world
For I would ride with you upon the wind,
Run on the top of the dishevelled tide
And dance upon the mountains like a flame!
—W. B. Yeats, The Land of Heart's Desire

ওগো পরীরা, এই নিরানন্দ জীর্ণ জগৎ থেকে আমায় নিয়ে যাও,
আমায় বের করে নিয়ে যাও।
তোমাদের সঙ্গে আমি পবন-মাতলির পৃষ্ঠে চড়ে ছুটব,
বন্যা যখন তার কুন্তল এলিয়ে দেবে, তখন তার চূড়ায় চূড়ায় আমি চলব,
এবং পর্বতে পর্বতে অগ্নিশিখার মতো নৃত্য করব।

ইহারা বলেন যে, এই বাস্তব জগৎ তো আসল জগৎ নয়— সেই অদৃশ্য ছায়ার জগৎই আসল জগৎ। কারণ, যাহাকে বাস্তব বলিতেছি তাহার বস্তুত্ব কোথায়? সীমা যে ক্রমাগতই তাহার সীমারূপ পরিত্যাগ করিতেছে। সে কথাটা তো আজ বিজ্ঞান অণুপরমাণুর মধ্যে পর্যন্ত দেখাইয়া দিতেছে। য়েট্‌স্ তাঁহার The Shadowy Waters -নামক

পরমরমণীয় আর-একটি নাট্যে নায়কের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

All would be well
Could we but give us wholly to the dreams,
And get into their world that to the sense
Is shadow, and not linger wretchedly
Among substantial things ; for it is dreams
That lift us to the flowing, changing world
That the heart longs for.

যদি স্বপ্নের হাতে আমরা আমাদের ছেড়ে দিতে পারতুম,
সে কী চমৎকার হত।
যে জগৎটা ইন্দ্রিয়ের কাছে ছায়ার মতো
যদি সেই জগতে প্রবেশ পেতুম,
যদি কঠিন বস্তুগুলোর মধ্যে হতভাগ্যের মতো দিন গোঁয়াতে না হত।
যে জগৎ কেবলই বয়ে চলছে, কেবলই বদলে চলছে,
হৃদয় যার জন্যে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে,
ওগো, এই স্বপ্নই যে আমাদের সেই জগতে পৌঁছে দেবে।

এখনকার কাব্যের এই জগৎ — এই flowing, changing world। এই বাস্তব জগতের মাঝখানেই সেই অদৃশ্য জগৎ ; এই বাস্তব রাজ্যের মধ্যেই সেই ছায়ার লীলা, সেই স্বপ্নের গতায়াত ; এই—

'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর !'

ফ্রান্সিস টম্প্‌সনের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে এই একই ভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায়—

O world invisible, we view thee,
O world intangible, we touch thee,
O world unknowable, we know thee,

Inapprehensible, we clutch thee!
Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air—
That we ask of the stars in motion
If they have rumour of thee there?
Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars!—
The drift of pinions, would we hearken,
Beats at our own clay-shuttered doors.

হে অদৃশ্য জগৎ, আমরা তোমায় দেখছি।
হে অস্পর্শ জগৎ, আমরা তোমায় স্পর্শ করছি।
হে অজ্ঞাত জগৎ, আমরা তোমায় জানছি।
হে ধারণার অগম্য, আমরা তোমায় মুষ্টি দিয়ে ধরছি।
সমুদ্রকে পাবার জন্যে মাছকে কি উড়তে হয়?
আকাশকে অনুভব করবার জন্যে পাখিকে কি ডুব দিতে হয়?
যে অগণ্য গ্রহ চন্দ্র শূন্যপথে বেগে ঘূর্ণমান,
তারা তোমার খবর পেয়েছে কি না সে কথা আমরা
জিজ্ঞাসা করছি কেন?
যেখানে সেই চক্রপথে ভ্রাম্যমাণ গ্রহেরা অন্ধকার জমিয়ে আছে,
আমাদের মন যেখানে উড়তে গিয়ে হতচেতন হয়ে ফিরে আসছে—
সেখানে নয়, সেখানে নয়।
আমরা যদি শুনতে পেতুম তবে দেখতুম যে, স্বর্গের পাখার বিধূনন
আমাদের এই দেহের মৃদর্গলবিশিষ্ট দ্বারের কাছেই শোনা যাচ্ছে।

গীতাঞ্জলির কবিতায় এই অদৃশ্য অস্পর্শ অজ্ঞাত জগতের রূপ স্পর্শ রস গন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অসন্দিগ্ধ রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই নবীন সাকীর দল এই কবিকে তাহাদের সকলের সেরা জানিয়া

তাঁহারই ললাটে জয়মাল্য বাঁধিয়া দিয়াছে এবং কাব্যের কুঞ্জবনে তাঁহাকে রত্ন-আসনে উপবেশন করাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জগৎও 'flowing, changing world'— চিরবহমান চিরপরিবর্তমান জগৎ— 'খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবার' জগৎ।—

পাগল-করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই-বা জানে—
চায় না ফিরে পিছন পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে
লুটে যাবার ছুটে যাবার চলবারই আনন্দে রে।

এই জগৎ যেমন বহমান চলমান, এই জগতের যিনি স্বামী তাঁহাকেও কবি নিশ্চল নির্বিকল্প নির্গুণ ঈশ্বর করিয়া ভাবেন নাই। লোকলোকান্তর-জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির যে যাত্রাপথ বাহিয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনখানি পূর্ণ পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, সেই পথেই যিনি সকল পথের অবসান, যিনি পরম পরিণাম, তিনি সঙ্গীরূপে পথিকরূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছেন। কবির জীবনে জীবনে এই লীলা করিবার জন্য তিনিও বাহির হইয়াছেন। 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে?'— সে কোন্ অনাদিকাল হইতে যে তিনি বাহির হইয়াছেন তাহা কে জানে। সেইজন্যই তো এই পরিচিত জগদ্দৃশ্যের মধ্যে সেই অদৃশ্যের ছায়া পড়ে—

'O world invisible, we view thee!'

একদিন ভরা শ্রাবণের প্রভাতে যখন রাত্রির মতো সমস্ত নিস্তব্ধ, যখন কাননভূমি কূজনহীন এবং ঘরে ঘরে সকল দ্বার রুদ্ধ, তখন সেই নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ বর্ষাপ্রভাতের জনশূন্য পথে চকিতের মতো সেই অনাদিকালযাত্রী একক পথিকের ক্ষণিক দর্শন মিলিয়া যায়—

কূজনহীন কাননভূমি,
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের 'পরে।

এমনি করিয়াই ক্ষণে ক্ষণে কত দৃশ্যে কত গন্ধে কত রসে সেই অদৃশ্য অনির্বচনীয় পরম রসকে বারম্বার পাওয়া গিয়াছে—

বিশ্বের সবার সাথে হে বিশ্ব-রাজন,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের 'পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য স্থির ও ধ্রুব হইয়া আছে এবং ইহাদের মধ্যে বস্তুতঃই কোনো দ্বৈত নাই। কবির কাছে এই বৈদান্তিক মতের কোনো অর্থ নাই। কারণ, জগতের সমস্ত রূপরূপান্তর এবং মানবজীবনের সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরাকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া একটি নিশ্চল শূন্য 'এক'কে একমাত্র করিবার একান্ত চেষ্টা করিলেও, মায়া কোনোমতেই দূর হইবার নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলনের মধ্যে যে একটি চিরবিরহ আছে, এই মায়াই যে উভয়ের মধ্যে সেই বিরহের ব্যবধান রচনা করিয়াছে। ইহাতেই তো মিলনের সার্থকতা। নহিলে মিলন যে আছে এ কথাটাই কে অনুভব করিত?

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে—
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।

সকল সৌন্দর্যের মধ্যে যে অনির্বচনীয় বেদনা, তাহা এই বিরহেরই বেদনা। গ্রহতারার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যে সেই বিরহের চিরব্যাকুলতা মানব-প্রেমের ও বাসনার সকল অতৃপ্তির মধ্যে সেই অনাদি বিরহের বেদনা। এই বিরহই রূপ ধরিতেছে বলিয়া রূপ ক্রমাগতই flowing and changing, বহমান এবং পরিবর্তমান।

গীতিমাল্যের একটি কবিতায় এই মায়ার তত্ত্ব বড়ো চমৎকার করিয়া কবি ব্যক্ত করিয়াছেন—

আমি আমায় করব বড়ো
এই তো আমার মায়া—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙিন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সুরে,
আপ্‌নারই বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

কবি বলিতেছেন, এই-যে আমি নিজেকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতেছি, ইহাই তো মায়া! কিন্তু এই মায়াটি যদি না থাকিত তবে কি আমাদের কান্নাহাসি আশাভয় এমন নানা রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিত — তবে যে বিচিত্রতার কোথাও কোনো স্থানই থাকিত না। এই তাঁতে-আমাতে যে আড়াল রহিয়াছে, তাহাতেই তো 'দিবানিশির তুলি দিয়ে হাজার ছবি আঁকা' হইতেছে। এই মায়ার পর্দাখানি না থাকিলে কি এত রঙ, এত আঁকাবাঁকা কিছুই থাকিত— বর্ণ ও আকার লোপ পাইয়া সমস্তই একমাত্র অখণ্ড এক হইয়া যাইত না? ভাগ্যে এই মায়া ছিল, নহিলে ঈশ্বরেরই বা আপনাতে আপনি থাকিয়া কী আনন্দ ছিল, এবং আমাদেরই বা অহংকার বিলুপ্ত হইয়া তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কী আনন্দ ছিল?

৮

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর

তুমি তাই এসেছ নীচে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,

তোমার প্রেম হত যে মিছে।

মায়ার আড়ালে সসীম ও অসীমের এই খেলাটাই সমস্ত জগতের খেলা, সৃষ্টির খেলা, আমাদের জীবনের খেলা বলিয়া সসীম ক্রমাগতই অসীমে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে এবং অসীম ক্রমাগতই সসীম-রূপে আপনাকে ধরা দিতেছে। আমাদের জীবনের পথে যেমন আমাদের জীবন 'প্রতিপদেই··· উৎসুক অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে', সেইরূপ সেই পথের যিনি চিরসঙ্গী তাঁহারও রূপের অন্ত নাই। ক্ষণে ক্ষণে 'তন্নবতামুপৈতি'। সন্ধ্যার গভীর ছায়াগহন নদীর ঘাটে কোন্ 'অজানার বীণাধ্বনি' বাজে, ঝড়ের রুদ্র মাতুনির মধ্যে 'মেঘের জটা' উড়াইয়া কাহার অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়, 'প্রভাতের আলোর ধারায়' কাহার একটি নতমুখ মুখের উপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঋতুতে ঋতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত নব নব রঙিন বেশে দেখা দেয়। শুধুই কি তাহার মনোহরণ বেশ! প্রভাতে শুধু 'অরুণবরণ পারিজাত লয়ে হাতে' সোনার রথে চড়িয়া বাতায়নের কাছে একটিবার আসিয়া ঘরের অন্ধকারকে আনন্দে কম্পিত করিয়াই কি সে চলিয়া যায়? তাহার ঝড়ের বেশ। তাহার মৃত্যুর বেশ। জীবনের সকল রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের লীলা।

৩

আমরা দেখিলাম যে, গীতাঞ্জলির হিরণ্ময় পাত্রখানি অতীন্দ্রিয়লোকের অনির্বচনীয় রসে পূর্যমান এবং য়েট্স্ টম্প্‌সন প্রভৃতি আধুনিক কোনো কবির কাব্যের পেয়ালা সেই রসে এমন ভরপুর নহে বলিয়া গীতাঞ্জলি সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে যদি কেবল-

মাত্র দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের মাঝখানের পর্দাটি তুলিয়া ধরা হইত এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপরে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের অপরূপ আলো পড়িয়া সকল রূপরস সকল শব্দগন্ধকে যে কী অনির্বচনীয় বেদনায় ঝংকৃত করিয়া তোলে যদি গানে কবি তাহারই আভাসমাত্র দিতেন— তবে কাব্য হিসাবে ইহা অতুলনীয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে শুধু উপলব্ধির কথা তো নাই— কেমন করিয়া সেই উপলব্ধি সম্ভাবনীয় হইল তাহার সাধনার ইতিবৃত্তও আছে। কাব্যহিসাবে এই সাধনার-ইঙ্গিত-সম্বলিত কবিতাগুলি নিকৃষ্ট— ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় কবি Andre Gide এইরূপ কোনো কোনো কবিতাকে 'নৈতিক' কবিতা বলিয়াছেন দেখিলাম।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য হইতে গীতিমাল্য পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগুলি হইতে অবচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাপুষ্পের সাজি, সুতরাং তাহার কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধেই যদি Gide'এর এ কথা মনে উদয় হইয়া থাকে তবে কেবলমাত্র বাংলা গীতাঞ্জলি পাঠ করিলে এ কথা তাঁহার পুনঃপুনই মনে হইত। বাংলা গীতাঞ্জলির গানগুলিতে কবির অধ্যাত্মসাধনার বার্তার ভাগই বেশি, পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণীর ভাগ কম।

বাংলা গীতাঞ্জলির যে-সকল গানে কবির অধ্যাত্মসাধনার আভাস-ইঙ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে সাজাইলে কবির সাধনার একটি সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে পারা যায়। মোটামুটি সাধনার তিনটি ধারা আমি ধরিতে পারিয়াছি ; যথা :

১ সংসারের দুঃখ-আঘাত-বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহারা তাঁহার 'দূতী' ; তিনি যে আমাদের জন্য অভিসারে বাহির হইয়াছেন ইহারাই সেই সংবাদ জানায়। আমাদের চিত্ত যখন অসাড় থাকে তখন এই দুঃখ-আঘাতই তো তাঁহার স্পর্শ, তিনিই আমাদের জাগাইয়া দেন। ধূপকে না পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ দেয় না, দুঃখের

আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পূজা তাঁহার দিকে উচ্ছ্বসিত হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন, 'আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।' এই ব্যথার গানই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি।

২ 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।' অহংকারের বাঁধন যতক্ষণ প্রবল ততক্ষণ বিশ্বের সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইতেই পারে না— কারণ অহংকার 'সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে আপনাকে যে বাজাতে চায়।'

গীতিমাল্যের একটি গান আছে—

বেসুর বাজে রে,
আর কোথা নয়, কেবল তোরই
আপন-মাঝে রে!

এই অহংকারের মধ্যেই সমস্ত বেসুর— এইখানে বিশ্ব প্রতিদিন প্রতিহত, আনন্দ সংকীর্ণ, প্রেম সংকুচিত। এই অহংটিকে তাঁহার পায়ে বিসর্জন না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নাই।

৩ এ দেশের 'সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে' অপমানের তলায় ভগবানের চরণ নামিয়াছে— সেইখানে তাঁহাকে প্রণাম না করিলে তাঁহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেইখানে তাহাদের সঙ্গে এক না হইলে 'মৃত্যুমাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান'— সেই বড়ো যাত্রায়, সেই-সকল মানুষের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে কর্মযোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল কর্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি। কারণ—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।

বাংলা গীতাঞ্জলিতে কবির সাধনার ধারার এইরূপ সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া গীতাঞ্জলিতে যে-সকল কবিতায় সাধনার সফলতার মূর্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা যে কত সত্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু সচরাচর আর্টিস্টের কাছে আমরা তাঁহার সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলটাই পাই, কেমন করিয়া সে ফল ফলিল সে সংবাদ চাপা থাকে। কারণ, পাকশালায় রন্ধনের সামগ্রী যখন স্তূপীকৃত তখন তাহাতে কোনো আনন্দ নাই ; কিন্তু যখন অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয় তখনই ভোজের প্রকৃত আনন্দ। গীতাঞ্জলির এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট নহে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারি— শুধু প্রভেদ এই যে, মানুষ ডায়ারি লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতন না হইয়া পারে না, এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের স্পর্শে তাঁহার অপূর্ব পুলক, তাঁহার অপেক্ষা ও আশা, আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, প্রবল দুঃখ ও আঘাতের মধ্য দিয়া কেবলই জাগরণ, তাঁহার সুদূর পরিণামের দৃষ্টি— সমস্তই স্তরে স্তরে পত্রে পত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শিল্পীর মতো কেবল শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফল দান করিয়া কবি বিদায় লন নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্যান্য সকল কাব্যের অপেক্ষা গীতাঞ্জলির সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিতেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে একখানি পত্রে প্রবীণ সাহিত্যিক স্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রুক এই কথাটিই বলিয়াছিলেন।

কিন্তু কবির অধ্যাত্মসাধনার কথা মানুষের যতই উপকার সাধন করুক, তাহা সেই 'আঘাত করা বোঁটাতে', তাহা 'ফুল ফোটানো' নহে। একজনের সাধনা আর-একজনের জীবনকে সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু সাধনা নিজেই যখন কূলে উত্তীর্ণ হয় নাই তখন তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, যে ব্যক্তি নির্ভর দেয় এবং যে ব্যক্তি নির্ভর করে উভয়কেই ডুবিতে হয়। সকল দেশেই গুরুবাদ এইজন্য অন্ধ অনুকরণেরই সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, কোনো একজন মানুষের পন্থা আর-একজনের পন্থার সমান নহে। যে যে-পন্থা দিয়াই যাউক, গম্যস্থানে পৌছিয়া সেখানকার কথা বলিলে আর ভয় নাই, কারণ সেখানকার আনন্দের হিল্লোল তখন সকল বিচিত্র পথের মধ্যেই সমান হিল্লোলিত হইবে। আমাদের দেশের লোক সাধনার বিচিত্রতাকে, 'varieties of religious experience'কে, উইলিয়ম জেম্‌সের মতো বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, একটি বিষয়ে এ দেশের লোকের বোধ সুপরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্মসাধনার ফলটিতে ঠিক পাক ধরিল কি না তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি। কথায় আমাদের চিঁড়া ভিজাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোক শ্রুতিধারণের মতো করিয়া যে সকল ভক্তদের বাণী ও সংগীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা শ্রবণমাত্র আমরা এ বিষয়ে আমাদের জাতির প্রতিভা বুঝিতে পারিব। ভক্তির সঙ্গে ভেক এ দেশে মিশিয়া আছে সত্য ; কিন্তু কালের চালুনিতে ভেকের রচনা তলায় থিতাইতেছে কই ?

আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবৃক্ষের পরিণামের দিকে চাহিয়া আছি ; একটা গীতাঞ্জলিকেই আমরা সেই জীবনমহাবৃক্ষের পরিণত ফল বলিতে যাইব কেন ? গীতাঞ্জলিকে পশ্চিম বেশি বুঝিয়াছে এ কথা তাহারা গর্ব করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা সত্য নয় জানি। যথার্থ বোধ জনসংখ্যার আধিক্যের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর

কোনো কবিকেই বহু লোকে বুঝে নাই। আমরা যে কবিকে তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনের ভিতর হইতে দেখিতেছি, তাঁহার জীবনের পশ্চাতে যে বহুযুগের অধ্যাত্মরসধারা তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে তাহাকে দেখিতেছি— কিছুই আমাদের কাছে ঝাপসা নহে। আমরা জানি, তাঁহার প্রাণের মূল জীবনের সুখদুঃখময় সকল বিচিত্র রসের মধ্যে কত দূরে গভীরতম তত্ত্বতে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের আলোকে সমীরণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ করিয়া দিকে দিকে সেই বিচিত্র জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের শাখাপ্রশাখা কী আশ্চর্য পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ক্রমে যখন শাখাগ্রভাগে পরিণত জীবনের ফল ধরিল তখন তাহার কাঁচা রঙ আমরা দেখিয়াছি— তখনও তাহা রসে মধুর হয় নাই, জীবনের ভোগের বৃন্তে তাহার জোড় দৃঢ়বদ্ধ। ক্রমে ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পূর্ণ হইতে লাগিল, তাহার ভিতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদানরূপে অত্যন্ত অনায়াসে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার পুষ্পদল ছিন্ন হইয়া তাহার ভোগের বৃন্ত শিথিল হইল— তখন তাহার সেই বিশ্বের কাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে আমরা যে চিনি নাই এ কথা স্বীকার করি না। কিন্তু সেই অঞ্জলিকেই সম্পূর্ণ বলিতে যাইব কেন? সে তো রসের ভারে একেবারে অবনত হয় নাই— তাহার রসের কথার চেয়ে তাহার সাধনার কথা, তাহার বেদনার কথা যে অধিক। এই নবপ্রকাশিত গীতিমাল্যের গানগুলি রসে টুস্‌টুসে ফলের মতো— স্পর্শমাত্রেই যেন ফাটিয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে সাধনার বিশেষ কোনো বার্তাই নাই— সেইজন্য বেদনার মেঘমলিনিমা নাই, আগাগোড়া আনন্দের জ্যোতির্ময় উচ্ছ্বাস। গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্য এই দুই নামের মধ্যেই দুই কাব্যের পার্থক্য দিব্য সূচিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলি যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে গীতিনিবেদন, সেখানে—

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
বন্ধু ব'লে দু হাত ধরি নে।

গীতিমাল্য বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। দূরত্বের বাধা দূর হইয়া অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয়।—

বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারই গলার মাল্য ক'রে
করব মূল্যবান!

১৩২১

গীতিমাল্য

ইংরেজি গীতাঞ্জলির যতগুলি সমালোচনা বিলাতি কাগজে পড়িয়াছি তাহার অধিকাংশেরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক বা মরমী কবি মনে করার জন্য মিষ্টিক সাহিত্যের সহিত তাঁহার কাব্যের সৌসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বিলাতি সমালোচকেরা খৃস্টান ভক্তিসাহিত্যের সঙ্গে গীতাঞ্জলির তুলনা করিয়াছেন; কেহ কেহ বা হিব্রু সামগাথা, ডেভিড আইজায়া প্রভৃতি ভক্তদের বাণীর সহিত তাঁহার কাব্যের সারূপ্য ঘোষণা করিয়াছেন। জলালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি দু-একজন সুফি কবির নাম পশ্চিমে বিখ্যাত হইয়াছে; সুফি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিয়া কোনো কোনো সমালোচক গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে সুফি কবিদের রচনা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক উপাধিতে ভূষিত করা ও মিষ্টিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের সৌসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করাটা ইংরেজ সমালোচকের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র হয় নাই। এক সময় ছিল যখন নাটক লিখিলেই লোকে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের সঙ্গে তুলনা করিত। এখন দেখিতে পাইয়াছে যে, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকই নাটকের একমাত্র রূপ নয়। শেলির প্রমিথিউস আন্‌বাউণ্ড্ বা চেঙ্কি-ও নাটক; ব্রাউনিঙের প্যারাসেলসাস্ বা পিপা পাসেস্‌ও নাটক; আবার য়েট্‌সের শ্যাডোয়ি ওয়াটার্‌স্, মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড, বার্নার্ড্‌ শ'র ম্যান অ্যাণ্ড সুপার্‌ম্যান এবং ইব্‌সেনের পিয়ার গিণ্ট্-ও নাটক। নাটক ও খণ্ডকাব্যের রূপ ক্রমশই বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইতেছে। অধ্যাত্মকাব্যের রূপও যে খৃস্টান ভক্তবাণী বা হিব্রু সামগাথা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে, এ ধারণা ইউরোপীয়দিগের মনে এখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। কারণ, খৃস্টানধর্ম ছাড়া জগতে আর কোথাও যে ভক্তিধর্ম থাকিতে পারে, সে দেশের নানাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত

লোকেরও মনে এ বিশ্বাস নাই। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইহারা বলেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে খৃস্টান মিশনরিগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বাইবেলের ভক্তিবাদ শ্রবণ করিয়া এ দেশে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। কবীরের বাক্যাবলীর মধ্যে এক জায়গায় আছে যে, শব্দ হইতে সমস্তের উৎপত্তি, সকলের আদিতে শব্দ ছিল— তাহা পাঠ করিয়া কোনো বিখ্যাত ইংরেজ বিদুষীর মনে হইয়াছিল যে, কবীর সেন্ট্ জনের সুসমাচার হইতে নিশ্চয়ই ঐ ভাবটি ধার করিয়াছেন!

যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথকে খৃস্টান ভক্তকবিদের সঙ্গে তুলনা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। খৃস্টান ধর্ম ভক্তিধর্ম হইলেও প্রাচীন হিব্রুধর্মের বহু সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এই জগৎ যে জগদীশ্বরের দ্বারা আবাস্য নহে, তিনি যে সর্বভূতান্তরাত্মারূপে ইহার অন্তরতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত নাই— হিব্রুধর্মের ইহা এক মূল কথা। জগৎপতি থাকেন এক কল্পিত স্বর্গলোকে এবং এই জগৎ-যন্ত্র তাঁহার হস্তের দ্বারা নির্মিত হইলেও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাপী মনুষ্যের আবাসস্থান হইয়া আছে। যদিচ খৃস্ট মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং স্বর্গে পুনরায় লইয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে মানবরূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তথাপি স্বর্গ এবং মর্তের ব্যবধান তাঁহার দ্বারা দূরীভূত হয় নাই। তিনি মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহাকে ক্রুশের ব্যথা বহন করিতে হইয়াছিল। সেই ক্রুশ তাঁহার সকল ভক্তের জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন— সেই পরম দুঃখ-স্বীকারের উপর স্বর্গের অধিকারলাভের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। মানবের নিকটে ঈশ্বরের আত্মদান আনন্দের আত্মদান নহে, দুঃখের বলিদান— এই তত্ত্ব কোথায়, আর কোথায় উপনিষদের 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে',

আনন্দ হইতে সকল সৃষ্টির উদ্ভব— এই তত্ত্ব! আমাদের শাস্ত্রে বলে জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের, আনন্দের একাত্মযোগ, জগৎ ঈশ্বরের আনন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ। জগৎ সসীম, ঈশ্বর অসীম, কিন্তু সসীমের মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই জগৎ তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ— আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এ তত্ত্ব খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। সেইজন্য সসীম-অসীমের দ্বন্দ্ব সে দেশের ধর্মশাস্ত্রে কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে।

রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত— খৃষ্টীয় স্বর্গমর্তের কল্পিত ব্যবধানের তত্ত্ব, মনুষ্যের আদিম পাপের তত্ত্ব এবং খৃস্টের আত্মবলিদানের দ্বারা সেই পাপ হইতে উদ্ধারের তত্ত্ব তাঁহার কাছে অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রান্ত ভিন্ন আর কী প্রতিপন্ন হইতে পারে? সেইজন্য তাঁহাকে সেন্ট্ ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি বা ঐ শ্রেণীর খৃষ্টীয় সাধকদিগের সঙ্গে তুলনা করা নিতান্ত অসংগত হইয়াছে। উপনিষদের সঙ্গে বাইবেলের যেমন তুলনা চলে না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি বা মঠাশ্রয়ী খৃষ্টীয় কোনো সাধকের তেমনি তুলনা চলে না।

আমি অবশ্য ভুলি নাই যে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও প্লটিনাসের ভাববাদ যেখানেই খৃস্টধর্মের সঙ্গে তত্ত্বে এবং সাধনায় মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে সেখানেই খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব এবং সাধনা এমন একটি অভাবনীয় রূপ লাভ করিয়াছে যাহা বাস্তবিকই বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে না। খৃস্টধর্মে ঈশ্বরের সসীম ও অসীম স্বরূপের যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে— ঈশ্বর তাঁহার শক্তিতে অনন্ত কিন্তু প্রেমে সান্ত, এই-যে তাঁহার দ্বৈত খৃস্টধর্ম স্বীকার করিয়াছে— ইহাকে অবলম্বন করিয়া এক নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ভব জর্মান দেশে ঘটিয়াছে। জেকব বইমে, এই তত্ত্বের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা। জেকব বইমে, রুইজব্রুয়েক প্রভৃতি কোনো কোনো সাধকের সহিত আমাদের প্রাচ্য ভক্তিসাধকদিগের সৌসাদৃশ্য এইজন্য দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর খৃষ্টীয় সাধনা বলিতে উৎকট পাপবোধ ও তজ্জনিত

ব্যাকুলতা এবং মানবরূপী ভগবান খৃস্টের অনন্যশরণাগতির চিত্রই মনে জাগে। তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সাধনার সম্বন্ধ বড়োই অল্প।

উপনিষদের স্তন্যরসে রবীন্দ্রনাথ বর্ধিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যের মর্মস্থলে উপনিষদের তত্ত্ব বিরাজমান এ কথা বলিলেও, কেবলমাত্র উপনিষদ গীতিমাল্যের গানগুলির উৎস হইতে পারিত না। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাব আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া সাধক 'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি', আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন। সজ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ— জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে ধ্যায়মান হইয়া মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায়। উপনিষদ যেখানে সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখিবার কথা বলিয়াছেন সেখানেও আত্মস্থ হইয়া যোগস্থ হইয়া 'নিত্যোঽনিত্যানাং' সকল অনিত্যের মধ্যে তাঁহাকে নিত্যরূপে ধ্যান করিবার উপদেশই দিয়াছেন। উপনিষদের সাধনা এই অন্তর্মুখীন ধ্যানপরায়ণ সাধনা, অধ্যাত্মযোগের সাধনা। উপনিষদের ব্রহ্ম— দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীলারসময় বিশ্বরূপ ভগবান নহেন। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাস উপনিষদের মধ্যে নানা স্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে পরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছে এ কথা কোনোমতেই বলা যায় না। লীলাতত্ত্বের কথা এই যে, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, সকল বস্তু, সকল বৈচিত্র্য, মানবজীবনের সকল ঘটনা, সকল উত্থানপতন সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু— সমস্তই শ্রীভগবানের রসলীলা বলিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ভগবান অনাদি অনন্ত নির্বিকল্প হইয়াও প্রেমে অন্তের মধ্যে ধরা দিয়াছেন, সেইজন্যই তো কোথাও অন্তের আর অন্ত পাওয়া যায় না। 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।' সকল সীমাকে বন্ধ করিয়া সেই অনন্তের বাঁশি তাই নিরন্তর বাজিতেছে এবং তিনি বারবার জীবনের নানা গোপন নিগূঢ় পথ দিয়া

আমাদিগকে তাঁহার দিকে কত দুঃখক্লেশ কত আঘাত অভিঘাতের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সমস্ত জীবনের এই সুখদুঃখবিচিত্র পথ তাঁহারই অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলন ; এই পথেই কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া তিনি দেখা দিতেছেন। এই-যে বিশ্ব ও মানবজীবনের সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া অনুভূতি, বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ইহাই সার কথা।

উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্তশাস্ত্র তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকলা সমুৎসারিত হয় না। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বে অনুভূতির বিচিত্রতা ও প্রসার এমন বাড়িয়া যায় যে, কাব্যকলাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য উপনিষদ হইতে আমরা দর্শনশাস্ত্র পাইয়াছি ; কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ হইতে কেবল দর্শনশাস্ত্র নহে, অপূর্ব ভক্তিকাব্যসকলও সম্ভাবিত হইয়াছে। কেবল বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিতার কথা বলিতেছি না, উত্তর-পশ্চিমের কাব্য ও গানগুলিও সংখ্যায় বৈচিত্র্যে এবং রসগভীরতায় বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নহে, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা সে-সকল কাব্য ও গানের কত অল্প পরিচয় পাইয়াছি। জ্ঞানদাস রবিদাস কবীর দাদূ মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তকবিদের গানের যে দু-একটা টুকরা কালের স্রোতে এখনকার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে তাহা শতদলের ছিন্ন পল্লবের মতো সুগন্ধে প্রাণকে বিধুর করিয়া দেয়। মানুষের অন্তরের ভক্তি যখন তাহার অনুরূপ ভাষা লাভ করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করে তখন সে যে কী অপূর্ব জিনিস হয় তাহা এই উত্তর-পশ্চিমের ভক্তি-সাহিত্যে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্রউপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নন. এই দুই তত্ত্বই তাঁহার জীবনের সাধনায় জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ

নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার ভক্তিকাব্যের এই নবরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার কী পরিমাণ অংশ উপনিষদের এবং কী পরিমাণ অংশ বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের তাহা নির্দেশ করতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। কারণ, এ তো দর্শনশাস্ত্র নয়, এ যে জীবনের জিনিস। এ গান যে জীবন হইতে প্রতিফলিত হইতেছে। সে জীবন আপনার অধ্যাত্মপিপাসায় কোনো রসকেই বাদ দেয় নাই, তাহার মধ্যে সকল বিচিত্র রস মিলিয়া-জুলিয়া এক অভিনব মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য বৈষ্ণবকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা গীতিমাল্যের তুলনাই চলে না। ঐ কাব্য দুটির মধ্যে যে বৈষ্ণবভাব বহুলপরিমাণে নাই এমন কথা বলি না; কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে যাহা বৈষ্ণবভাব নয়, যাহা বৈষ্ণবভাবাবলীর সঙ্গে সংগত হইয়া তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে।

আরও একটি কারণে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব বা ভক্তকবিদিগের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কেবল যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব মিলিয়াছে এবং বাণী-রূপ লাভ করিয়াছে তাহা নহে, কবীর দাদূ প্রভৃতির মধ্যেও এই একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সুফিধর্ম, বেদান্ত এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এই ত্রিবেণীসংগমের তীর্থোদকে কবীরের অমর সংগীত অভিষিক্ত হইয়াছে। সেইজন্য তাহার অন্তরে যেমন কঠিন একটি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাধার, তাহার উপরে তেমনি ভক্তির রসোচ্ছ্বাস সংগীতের তরল ধারায় নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেই-সকল গানের সহিত গীতিমাল্যের গানের রূপভেদ আছে। গীতিমাল্য ও গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ যে 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'কল্পনা' 'ক্ষণিকার'ও রবীন্দ্রনাথ; যিনি প্রকৃতির কবি, মানব-প্রেমের কবি, যিনি সকল বিচিত্ররসনিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন, তিনিই যে এখন 'রসানাং রসতমঃ', সকল রসের রসতম ভগবৎ-প্রেমের গান গাহিতেছেন— ইহাতেই ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের ভক্তিসংগীতের

সঙ্গে এই নূতন ভক্তিসংগীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে। এমন ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কি না জানি না। কারণ, ধর্ম চিরকালই জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্য হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া সযত্নে সন্তর্পণে আপনাকে এক কোণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জীবনের গতি এক দিকে, ধর্মের গতি অন্য দিকে— জীবনের গতি প্রবৃত্তির দিকে, ধর্মের গতি নিবৃত্তির দিকে। সেইজন্য কবি ও ভগবদ্‌ভক্ত এ দুয়ের সম্মেলন দেখা যায় নাই। ভগবদ্‌ভক্ত হয়তো কবি হইয়াছেন অর্থাৎ ভক্তির গান লিখিয়াছেন— কিন্তু জীবনের অন্যান্য রসের প্রকাশ তাঁহার মধ্যে ফুটিয়াছে কোথায়? পক্ষান্তরে কোনো কবি যে ভক্তির গান লিখিয়া অমর হইয়াছেন তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না। কবীর বা দাদূ বা আর-কোনো ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রণয়কবিতা বা প্রণয়সংগীত লিখিয়াছেন ইহা কোনো-দিন যদি কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াও দেন তাহা হইলেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব না। কোনো পুরানো পুঁথির মধ্যে কবীরের লিখিত এমন ছত্র বাহির হওয়া অসম্ভব—

ভালোবেসে, সখি, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখিয়ো
তোমার মনের মন্দিরে।

কিম্বা—

সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।

জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ এমন আশ্চর্য প্রকাশ জগতের অল্প কবিরই মধ্যে দেখা গিয়াছে। পরিপূর্ণ জীবনের গান যিনি গাহিয়াছেন তিনি যখন অধ্যাত্ম-উপলব্ধির গান গাহেন তখন এসরাজের মূল তারের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি যে তারগুলি থাকে তাহারা যেমন একই অনুরণনে ঝংকৃত হইতে থাকে এবং মূল তারের সংগীতকে গভীরতর করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির

সুরের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি করে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে যে-সকল বিলাতি সমালোচক খৃস্টান ভক্তকবিদের সঙ্গে বা হিব্রু প্রফেট্‌দের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন তাঁহাদের তুলনা যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করেন তাঁহাদেরও তুলনা ঠিক হয় বলিয়া মনে করি না। বরং আধুনিক কালের যে-সকল কবি জীবনের সকল বিচিত্রতার রসানুভূতিকে অধ্যাত্মরসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে চান সেই-সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হইতে পারেন। ওয়াল্ট্‌ হুইট্‌ম্যান, রবার্ট্‌ ব্রাউনিং, এড্‌ওআর্ড্‌ কার্পেণ্টার, উইলিয়ম ব্লেক, ফ্রান্সিস টম্প্‌সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যজীবন-ধারার সঙ্গে বরং রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনধারার তুলনা করিয়া অধ্যাত্ম-রসবোধের বিকাশ কোন্‌ কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ব্রাউনিঙের শেষবয়সের ধর্মকাব্য Ferishtah's Fancies, হুইট্‌ম্যানের Sands at Seventy, কার্পেণ্টারের Towards Democracy এবং টম্প্‌সনের The Hound of Heaven প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা গীতিমাল্যের তুলনা করিলে এই শ্রেণীর ধর্মকাব্যে এই-সকল কবির মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুমিত হইবে।

আমার হাতের কাছে এই কাব্যগুলি নাই— কেবল টম্প সনের The Hound of Heaven'এর শেষ কয়েক ছত্র উদ্‌ধৃত করিতেছি—

'All which I took from thee I did but take,
Not for thy harms,
But just that thou might'st seek it in My arms,
All which thy child's mistake
Fancies as lost, I have stored for thee at home ;
Rise, clasp my hand, and come.'

Halts by me that footfall.
Is my gloom, after all,
Shade of His hand, outstretched caressingly ?

'লয়েছিনু যাহা কাড়ি
আমি লই নাই তাহা ক্ষতির লাগি—
ভেবেছিনু তুমি এসে
মোর হাত হ'তে নিজে লইবে মাগি।
অবুঝ শিশুর মতো
মনে ভেবেছিলে যাহা হারায়ে গেছে
জমিয়ে রেখেছি তাহা
দেখো, তোমারি লাগিয়া ঘরের মাঝে !
উঠ, ধরো হাত, এসো হে কাছে !'

থেমে গেল পদধ্বনি।
হায়, আমার মনের আঁধাররাশি—
সে কি তাঁর করচ্ছায়া ?
তিনি আদরের লাগি বাড়ান হাসি ?

ইহার জুড়ি কবিতা গীতিমাল্যে আছে—

এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।
হাসিতে আকাশ ভরিলে।
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা-কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে ॥

ভেবেছিল চির কাঙাল সে এই ভুবনে,
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে॥

এই উদ্ধৃত ছোটো গানটির মধ্যে অধ্যাত্মসাধনের প্রথম অবস্থায় ত্যাগের রিক্ততার সুগভীর বেদনা এবং শেষ অবস্থায় ভগবানকে অনন্যশরণ জানিয়া আশ্রয় করিবামাত্র মিলনের অপূর্ব আনন্দের সমস্ত ইতিহাস কী একটি সংহতরূপ লাভ করিয়াছে! টম্প্‌সন The Hound of Heaven'এ এই ইতিহাসকেই কত ফলাও করিয়া স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন— তাহা আশ্চর্য হইলেও গীতিমাল্যের এই গানের কলাসংযম তাহাতে লক্ষিত হয় না।

২

গীতিমাল্যের গোড়ার দিকে নয়টি কবিতা আছে। এবং ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্বে এই একই সময়ে রচিত গোটা-পনেরো গানও আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার হয়। পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোনো কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে এমন একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড়ো বড়ো পরিবর্তনগুলি প্রথমে কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিতমাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে অধুনা মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় subliminal consciousness বা

মগ্নচৈতন্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট উদাহরণ এমন বোধ হয় দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। কোনো কবির কাব্য যে তাহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোনো কবির জীবনে ঘটিয়াছে কি না জানি না। সেইজন্যই অন্য-সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশি করিয়া পাড়িতে হয়। ইহাকে অনেকে ব্যক্তিগত আলোচনা মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুত ইহা তাহা নহে।

কবির কাব্যের সঙ্গে জীবন একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া অন্য মানুষের জীবনে যে-সকল ঘটনা অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য, কবির কাছে তাহা একটি অভূতপূর্ব অসামান্যতা লাভ করিয়া বিস্ময়কর রূপে প্রতীয়মান হয়। দেশভ্রমণের বাসনা আমাদের সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাকে যতটা পারি দেখিয়া লইব এ সাধ মনের মধ্যে গোপনে গোপনে থাকে, সুযোগ পাইলেই ইহা প্রবল হইয়া চরিতার্থতার পথ অন্বেষণ করে। কত সময় কত অভাবিতপূর্ব কারণে এরূপ সুযোগ আসিয়াও আসে না, মনের একান্ত ইচ্ছার পূরণ হয় না। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারই কবির কাছে এমন একটি প্রবল ব্যাপার যে তাহা সমস্ত মনকে সমস্ত চৈতন্যকে নাড়া দিয়া কাব্যের মধ্যে একটা অননুভূত ভাবকে জাগাইয়া তোলে এবং জীবনকেও একটা নূতন রহস্যে মণ্ডিত করিয়া দেখে।

কবি যে ইউরোপ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তাহা এমনি একটি অসামান্য ব্যাপার ; অকস্মাৎ অজানা দেশে যাত্রার জন্য বিহঙ্গদলকে যেমন এক অশান্ত আবেগ ও চঞ্চলতা মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে প্রবৃত্ত করে, যাত্রার পূর্বে ঠিক তেমনি একটি অকারণ চাঞ্চল্য কবি অনুভব করিতে-

ছিলেন। কেন যাইতেছেন, সেখানে গিয়া কী উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—এ-সকল কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল। যাত্রার যাহা একমাত্র কারণ তাহা তো কবিতায় বহুপূর্বেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী!

কিন্তু এবারে সে কারণ ছিল না। এবারে কোনো কারণ না জানিয়াও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, এ যাত্রা তাঁহার তীর্থযাত্রার মতো—এ যাত্রা হইতে তিনি শূন্য হাতে ফিরিবেন না। এবার মহামানবতীর্থের যে শক্তিসমুদ্রমন্থনজাত অমৃত তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিবেন তাহাতে তাঁহার কাব্যের ও জীবনের মহা অভিষেক হইবে।

তীর্থযাত্রার জন্য এই ব্যাকুলতা যখন পূর্ণমাত্রায় মনকে অধিকার করিয়া আছে তখন হঠাৎ স্নায়ুদৌর্বল্যপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কবির যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল। কবি শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। ৪ হইতে ২১ সংখ্যা -চিহ্নিত যে কবিতা ও গানগুলি গীতিমাল্যে স্থান পাইয়াছে তাহারা সেখানে 'আমের বোলের গন্ধে অবশ' মধুমাসে রুগ্ন অবস্থায় রচিত। তখন কাজকর্ম দেখাসাক্ষাৎ সমস্তই বারণ হইয়া গিয়াছে—

কোলাহল তো বারণ হল,
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।

তাই বলিতেছিলাম যে, বাহির হইতে দেখিতে গেলে এই এক সামান্য ঘটনার আঘাতে এই নূতন 'প্রাণের আলাপে'র সূত্রপাত হইল।

কিন্তু এই কানে-কানে কথার রহস্যনিবিড়তাই যে এই সময়ের কবিতা ও গানগুলির বিশেষত্ব তাহা নহে। পৃথিবীর গভীরতম স্তরে যে উৎস

জমাট হইয়া আছে তাহার পূর্ণতার তো কোনো অভাব নাই; তথাপি বাহির হইবার বেদনায় তাহার সমস্ত অন্তর যেন ক্রন্দন করিতে থাকে। সেইরূপ এই কানে-কানে কথা যখন সবচেয়ে বেশি জমিয়াছে, যখন বিশ্বের একেবারে মর্মস্থলে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার অবকাশ ঘটিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই তাহাতেই চরম পরিতৃপ্তি হইল না— এই কথাই বারবার নানারকম সুরে বাজিতে লাগিল—

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে।…
সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে—
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

…

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।

…

এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।

অথচ কবিতাগুলির মধ্যে এই সুর নাই। তাহাদের মধ্যে পরিচিততম অভ্যস্ততম বস্তুর আবরণ উন্মোচিত হইয়া

সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়ে ছিল অজানা যে

সেই অজানাকে অত্যন্ত কাছাকাছি,অত্যন্ত প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধির কথা আছে। ৯-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, এই নদীর পারে এই বনের ধারে যে সেই 'অজানা' ছিলেন, সে কথা তো কেহই তাঁহাকে বলে নাই। কখনও কখনও ফুলের বাসে, দক্ষিনে হাওয়ায়, পাতার কাঁপনে মনে হইত যেন অত্যন্ত কাছেই তিনি। কিন্তু আজ এই 'নয়ন-অবগাহনি' স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়ায় সেই বন্ধুর এ কী হাসি, এ কী নীরব চাহনি দেখা দিল! 'লক্ষ তারের বিশ্ববীণা' এই নীরবতায় লীন হইয়া এইখানে আজ সুর কুড়াইতেছে, 'সপ্তলোকের আলোকধারা' এই ছায়াতে আজ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে! ১১-সংখ্যক কবিতাটি আরও চমৎকার! বিশ্বের একেবারে অন্তরতম কেন্দ্রস্থলে সমস্ত জীবনের সুদীর্ঘ পথখানি গিয়া মিলিয়াছে এবং সেই নিভৃত কেন্দ্রলোকটির গোপন দ্বার সমস্ত 'চরাচরের হিয়ার কাছে'ই আছে। এই জীবনপথিকের দীর্ঘ পথযাত্রার সেইখানেই অবসান। সেখানে কে আছে? যে আছে—

অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা যাওয়া গোপনে।

সেই 'জগৎ-জোড়া ঘর'টিতে কেবল দুটিমাত্র লোকের ঠাঁই হয়—সেই বিশ্বপদ্মের কেন্দ্রগত মধুকোষে যে অপূর্ব লোকটি বসিয়া আছেন তাঁহার এবং সেই কমলমধুপিয়াসী যে চিত্তভ্রমর তাহার উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার— কেবলমাত্র এই দুজনার। এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতেই সসীম-অসীমের, সরূপ-অরূপের, জীব ও ভগবানের নিত্য প্রেমলীলার উপলব্ধির নিবিড় আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ লীলা বিশ্বের সেই নিভৃততম অন্তরতম কেন্দ্রটিতে উদ্‌যাপিত। এ লীলা বিশ্বের

সকল সৌন্দর্যে, সকল আনন্দে, বিশ্বমানবের সকল বিচিত্রতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ছাপাইয়া পড়ে নাই। ‘সেথানে আর ঠাঁই নাহি তো কিছুরই।’ সেইজন্যই ঐ আর-একটি সুর আসিয়া এই নিভৃত বিলাসকে ভাঙিয়া দিল— ঐ বাহির হইয়া পড়িবার সুর।

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।

কেবল এই কবিতাগুলির সুর যদি চিত্তকে ভরপুর করিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে কখনোই ঐ বাহির হইয়া পড়িবার সুর এমন প্রবলতা লাভ করিতে পারিত না। কবিতাগুলির সুর বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ সুর— রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতত্ত্বে এই সুরই তো ফুটিয়াছে। সেই তত্ত্বে এই কথাই বলে যে, ভগবান জীবনকে ভুলাইবার জন্যই সৌন্দর্যের বেশ পরিয়া দেখা দেন, অরূপ হইয়াও রূপ ধরেন, এবং দুঃখের দুর্গম পথের মধ্য দিয়া অভিসারে বিশ্বের অন্তরতম জায়গায় সেই নিভৃত নিকুঞ্জে সকল সংস্কারের পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন—

আমার পরশ পাবে ব'লে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ তো জানে না তা।
রইল আকাশ অবাক মানি,
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।

কিন্তু সে সুরে কুলাইল না। লোহিত সমুদ্রে এই গান জাগিল—

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

আরো আরো আরো চাই। কেবল তৃপ্তির বিরতি চাই না, অতৃপ্তির চিরগতি চাই। কেবল উপলব্ধির শান্তি নয়, নব নব বেদনাময় চৈতন্য।

৩

ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে জাহাজে, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পরে ভাদ্র হইতে মাঘ পর্যন্ত ছয় মাসে, কবি যে গীতিমাল্য গাঁথিয়াছেন সে গানগুলি একেবারে স্বচ্ছ, ভারমুক্ত, ফুলেরই মতো নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত। গীতাঞ্জলির কোনো গানই এই গানগুলির মতো এমন মধুর, এমন গভীর, এমন আশ্চর্য সরল নহে।

ইংলণ্ডে 'জনসংঘাতমদিরা' স্বভাবতই মানুষকে কিছু-না-কিছু চঞ্চল করিয়া দেয়। তার উপর ইংলণ্ডের গুণীরসিকসমাজের স্তবমদিরা যখন পাত্র ছাপাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন সেই শান্তিভঙ্গকারী উত্তেজনা-উন্মত্ততা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখিয়া 'তোমারি নাম বলব', 'ভোরের বেলা কখন এসে' প্রভৃতি সরলমধুর গান রচনা করা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। এ-সকল গানের নীচে 'Cheyne Walk, London' লেখা না থাকিলে এ গানগুলি ইংলণ্ডে রচিত এ কথা মনে করাই অসম্ভব হইত। ইংলণ্ডে গুণীসমাজ কবির গলায় যে প্রশংসার মণিহার পরাইয়া দিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে একটিমাত্র গান গীতিমাল্যে আছে— 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'।

কবির সৌন্দর্যসাধনা যেমন 'কড়ি ও কোমল' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র ভোগ-প্রদীপ্ত বর্ণ-উজ্জ্বলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র 'মানসসুন্দরী', 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণপ্রাচুর্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে ক্ষণিকার বর্ণবিরল ভোগবিরত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ নৈবেদ্য খেয়া গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশ কবির অধ্যাত্মসাধনা এই গীতমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধপ্রাখর্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। উপনিষদে আছে, 'পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেনাহ্নতিষ্ঠেৎ'— পাণ্ডিত্যকে, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নজনিত সংস্কারগত বুদ্ধিকে, দূর করিয়া বাল্যে, অর্থাৎ

উপলব্ধির সারল্যে, প্রতিষ্ঠিত হও। গীতিমাল্যের ৩১-সংখ্যক কবিতায় আছে যে, কবি সমস্ত জীবনের পশরা মাথায় করিয়া হাঁকিয়া ফিরিয়াছেন — কে তাঁহাকে কিনিয়া লইবে ? মান নয়, ধন নয়, সৌন্দর্য নয়, কিন্তু সংসারসাগরতীরে যে শিশু ঝিনুক লইয়া আপন-মনে খেলিতেছে সেই তাঁহাকে বলিল, 'তোমায় অমনি নেব কিনে।' তাহারই কাছে সব বোঝা নামিল, সেই বিনা মূল্যে কবিকে কিনিয়া লইল। তাই 'যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে, শিশুর নবীন জীবনবাঁশিতে,' সেই সুরে গীতিমাল্যের সরল গানগুলি বাঁধা হইয়াছে।

বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে।

...

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।...
জীবনপদ্মে সংগোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

ব্রাউনিঙের The Boy and the Angel -নামক একটি কবিতায় আছে যে, একটি কাঠুরিয়া ছেলে বনে কাঠ কাটিত আর সর্বদাই ঈশ্বরের নামগান করিত। সেই গান স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনতলে গিয়া পৌছিত এবং তাঁহাকে পুলকিত করিত। তিনি স্বর্গের দেবতাদিগকে বলিতেন, সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা যে দিবানিশি আমার বন্দনাগান করিতেছে সে গানের সুর প্রাচীন, তাহা অনাদিকাল হইতে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু ঐ-যে একটি ছেলে আমায় ডাকে, ঐ ডাক আমার বুকে লাগিয়াছে— ঐ ডাকের মতো মিষ্ট ডাক আর শুনি নাই।

ঈশ্বরের এই কথা শুনিয়া স্বর্গের দেবতাগণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এঞ্জেল গেব্রিয়েল পাখা মেলিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিলেন এবং সেই বালকের দেহ ধারণ করিয়া সেই কাঠ কাটার কাজে নিরত রহিলেন। তিনি সেই কাঠ কাটেন এবং ঈশ্বরের নামগান করেন।

বালক গেল মরিয়া। সে দেহান্তর ধারণ করিয়া রোমের পোপ হইল। পোপ হইয়া সে গির্জায় বড়ো গলায় বড়ো সুরে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল।

ঈশ্বর বলিলেন, আমার সমস্ত সৃষ্টির সংগীত যে বন্ধ হইয়া গেল— 'I miss my little human voice!' আমি সেই ক্ষুদ্র মানবকণ্ঠটি যে আর শুনি না।

গেব্রিয়েল সে সুর কেমন করিয়া পাইবেন? আর পোপের সুর, সেও যে স্বতন্ত্র।

গেব্রিয়েল তখন লজ্জিত হইয়া পোপের প্রাসাদে আসিয়া পোপকে দেখা দিলেন। বলিলেন, আমি তোমার দেহ ধারণ করিয়া তোমার সুর সাধিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি পারিলাম না। যাও, তুমি তোমার স্থানে পুনরায় গিয়া পূর্ববৎ ঈশ্বরের নামগান করো।

ব্রাউনিং এই The Boy and the Angel কবিতায় যে কথাটি বলিতে গিয়াছেন তাহা ওই একটিমাত্র 'তোমারি নাম বলব' গানে,

তত্ত্বরূপে নয়, সেই 'human voice' -রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই গানেই 'তোমার সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে' এই গান সত্য হয়। এ গানে তত্ত্বের কথা নাই, সাধনার কথা নাই। এ কেবল সেই একটি ডাক— সেই একটিমাত্র ডাক এমন পরিপূর্ণ, এমন গভীর, এমন সরল যে তাহাতে এই আশ্বাস সুনিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।

৪

গীতিমাল্যে অধ্যাত্মসাধনার সংশয়-সংগ্রাম-বেদনা-অপেক্ষা-লীলায়িত বিচিত্র অবস্থা ও অনুভাবের গান যথেষ্ট নাই, এ কথা আমি পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। গীতাঞ্জলি হইতে গীতিমাল্যের এইখানেই শ্রেষ্ঠত্ব এ কথাও আমি বলিয়াছি।

বাস্তবিক গীতিমাল্যে কবি যেখানেই তাঁহার ভিতরকার সাধনার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন সেখানেই তিনি সাধনার পথ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধ্যাত্মসাধনার যে-সকল মার্গ নির্দিষ্ট আছে সে-সকল কোনো পন্থারই তিনি পন্থী নহেন। বিবেক-বৈরাগ্য বা শমদমাদিসাধন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতি যোগসাধন, বৈষ্ণবের শান্তদাস্যাদি পঞ্চরসের সাধন— এ কোনো সাধনপ্রণালীই তাঁহার জীবনের পক্ষে উপযোগী নয়। তাঁহার পথ তাঁহার আপনার পথ— কোনো শাস্ত্র বা গুরুর দ্বারা সে পথ নির্দেশিত হয় নাই।

ইউরোপীয় মিষ্টিক সাধকদিগের পন্থা প্রণালী বা সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সঙ্গেও তাঁহার পন্থার বা সাধনার অবস্থার কোনো মিল নাই।

প্রথমত তাঁহারা যাহাকে conversion বলেন, অর্থাৎ চৈতন্যের অকস্মাৎ উদ্‌বোধন এবং ধর্মজীবনের জন্য ব্যাকুলতা; তার পর যাহাকে purgative stage বলেন, অর্থাৎ সংসারবৈরাগ্য পাপবোধ দীনতা এবং আত্ম-ত্যাগ; তার পর যাহাকে illuminative stage বলেন, যখন ঈশ্বরের সহবাসজনিত ভূমানন্দ সাধকের চিত্তকে উদ্‌বেলিত করিয়া তোলে, যখন বহির্লোকে 'ঊর্ধ্ব পূর্ণ অধঃ পূর্ণ পূর্ণ সর্বচরাচর' এবং চিদ্‌লোকে নানা visions বা দর্শন স্বেদকম্পপুলক প্রভৃতি রসভাবকে উদ্রিক্ত করে; এবং সর্বশেষ চরম অবস্থায় যাহাকে unitive stage বলেন, জীবাত্মা-পরমাত্মায় অচ্ছেদ্য একাত্মতা— সে-সকল অবস্থা এবং সে-সকল অবস্থা-লাভের জন্য সাধনপ্রণালী রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনক্ষেত্রে মেলে কি না দেখিতে গেলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনপন্থা এদেশীয় বা বিদেশীয় কোনো সাধনপন্থার সঙ্গে মেলে না। ইহাকে subjective individualism বল, স্বানুভূতি বল, আর যাই বল—তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পৃথিবীতে এপর্যন্ত যে-কোনো সাধক যথার্থ কোনো সত্য-উপলব্ধিতে আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং কোনো সত্যবাণী প্রচার করিয়াছেন, তিনি আপনার পথেই আপনি চলিয়াছেন, দশের পথে যান নাই, শাস্ত্রবাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন নাই, গুরুকরণ করিয়া গুরুর হাতেই আপনার বুদ্ধিকে গচ্ছিত রাখেন নাই, একেবারে তীরের মতো সোজা সেই পরমলক্ষ্যে গিয়া বিদ্ধ হইয়াছেন। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ— সেই তন্ময়তা যে কোথা হইতে তাঁহারা পাইয়াছিলেন, যাহাতে বিষয়তৃষ্ণা আপনি বিনা চেষ্টায় তিরোহিত হইয়াছে, প্রেম সর্বভূতে আপনি প্রসারিত হইয়াছে, এবং হৃদয়গ্রন্থিসকল আপনি ছিন্ন হইয়াছে, তাহার কোনো ইতিহাস নাই। পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রের নির্দিষ্ট সাধনার ধাপ অনুসরণ করিয়া কোনো বড়ো সাধকের সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয় নাই। আগে purgative

পরে illuminative পরে unitive— এমন করিয়া ধাপে ধাপে খৃষ্টীয় কোনো সাধকেরও সাধনের অবস্থাগুলি উন্নীত হয় নাই। শাস্ত্র, গুরু, মার্গ, এ-সমস্ত দশের জন্য। তাহাদের পক্ষে individualism বা ব্যক্তি-তন্ত্রতা সত্য নহে। কিন্তু যিনি আপনার পথে আপনি চলিবেনই চলিবেন এবং সেই চলার দ্বারাই যাঁহার উপলব্ধি গভীর হইতে গভীরতর হয় তাঁহার পক্ষে নিজের পথে চলার বিপদ কোথায়? তিনিই তো আসল individual বা ব্যক্তি, তাঁহার individualism বা ব্যক্তিতন্ত্রতা তো যথার্থরূপে সার্থক; কারণ, তাহা তাঁহাকে ক্রমশ ব্যক্ত করিয়া তুলিবেই তুলিবে— সত্যে আনন্দে কল্যাণে পূর্ণতায় ব্যক্ত করিয়া তুলিবে। গীতিমাল্যে তাই কবি কোথাও ব্যর্থতার কান্না কাঁদেন নাই, তিনি বেশ জোরের সহিতই বলিয়াছেন—

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার।
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।

পথ আমারে পথ দেখাবে! সে পথ একমাত্র individualএর নিজস্ব পথ— সে পথের সঙ্গে অন্য কাহারও কোনো পথের সাদৃশ্য নাই।

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
'পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে
ফিরে যা রে।'
ফেরার পন্থা বন্ধ করে
আপনি বাঁধ' বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে।

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।

'জ্ঞানী' হইতেছেন সেই-সব লোক যাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হন— এ সাধনা 'বস্তুতন্ত্র' কি না, এটা subjective individualism'এর কোঠায় পড়ে কি না, এবং যদি পড়ে তাহা হইলে এ সাধনার শেষফল কী দাঁড়াইবে ইত্যাদি। এই-সকল লোক একটা সোজা মোটা কথা ভুলিয়া যান যে, জীবন জিনিসটা কোনো শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ধরা দিবার মতো জিনিস নহে। সূর্যাস্তের সময়ে মেঘের মধ্যে যখন বর্ণচ্ছটার পর বর্ণচ্ছটা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে থাকে তখন সেই-সকল সূক্ষ্ম বর্ণবিভঙ্গের শ্রেণীনির্দেশ-কার্য যেমন কোনোমতেই সম্ভাবনীয় নহে, কারণ মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার পরিবর্তন দেখা দেয়— সেইরূপ জীবন যেখানে স্বভাবত বিকাশলাভ করিতেছে সেখানে তাহার নিত্যনবীন অভাবনীয় গতিশীল পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যকে তত্ত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া শ্রেণীর খোপের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। জীবন্ত সাধনার কতটুকু সাব্‌জেক্‌টিভ বা আত্মতন্ত্র, কতটুকু অব্‌জেক্‌টিভ বা বস্তুতন্ত্র— এ-সকল বিচার করিতে যাওয়াই মূঢ়তা মাত্র। এ তো জড়বস্তু নয় যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় গুঁজিয়া রাখা যাইবে— এ যে জৈববস্তু, এ যে নিত্যক্রিয়াশীল, নিত্যপরিবর্তনশীল।' তাই কবি বড়ো খেদে বলিয়াছেন—

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে,
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবই সোজাসুজি।
হৃদয়কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।

কাণ্টের categories ভাঙিবার জন্য আধুনিক যুগে বের্গ্‌সঁর অভ্যুদয় হইয়াছে। কাণ্ট্ আইডিয়াকে স্থিত দেখিয়াছিলেন, বের্গ্‌সঁ তাহাকে চিরচঞ্চল চিরগতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। হেগেল 'dialectic movement' তত্ত্বে চিন্তার গতিশীলতা প্রতিপাদন করিলেও, নামের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। আশা করা যায় যে, এক সময়ে আমাদের দেশে যেমন বৈষ্ণব আচার্যেরা দ্বৈত ও অদ্বৈত -বাদের বিচিত্র বাদানুবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-নামক এক অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোনো তত্ত্ব ইউরোপেও উদ্ভাবিত হইবে। ভাইটালিজ্‌ম্ এ কালের সেই তত্ত্ব।

Not law but aliveness, incalculable and indomitable is their motto ; not human logic, but actual human experience is their text... The Vitalists see the whole cosmos as instinct with spontaneity ; as above all things free. অর্থাৎ, নিয়ম নহে, কিন্তু অপরিমাণ ও অদম্য প্রাণময়তা এই তত্ত্বের আদর্শ ; এই তত্ত্বের কথা এই যে, লজিকের দ্বারা কোনো সত্য স্থিরীকৃত হয় না, বাস্তব অভিজ্ঞতাই সত্যনির্ধারণের মানদণ্ড।

এই তত্ত্বের তাত্ত্বিকগণ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বতঃস্ফূর্ত দেখেন—তাহা কোনো নিয়মনিগড়ের দ্বারা কোথাও বদ্ধ নহে, সর্বত্র মুক্ত। এক কথায়, এই তত্ত্ব বলে যে, জীবন সকল তত্ত্বের চেয়ে বড়ো। এই নূতন জীবনতত্ত্বই এই বাক্যের মর্ম বুঝিতে পারে—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।

এই জীবনকে যতই জানা যাইবে ততই জীবনের জীবনকেও বেশি

করিয়া চেনা যাইবে। কারণ, জীবনই একমাত্র তত্ত্ব। হুইট্‌ম্যান তাঁহার Assurances-নামক কবিতায় বলিয়াছেন— আমার ছত্রটি ঠিক স্মরণে নাই— I know that exterior has an exterior and interior has an interior— আমি জানি যে, যাহাকে বাহ্য বলি তাহারও একটি বাহির আছে, যাহাকে অন্তর বলি তাহারও একটি অন্তর আছে। সমস্ত বিশ্বতত্ত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীমের তত্ত্ব আরও স্ফুটতর হইবে, যেমন অধুনা বিজ্ঞানের দ্বারা হইতেছে। আত্মতত্ত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমাত্মতত্ত্ব আরও ব্যক্ততর হইবে।—

এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।

৫

অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশে দুইটি সাধনায় বিরোধ চলিতেছে— এক নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাধনা ; আর একটি বৈষ্ণব সাধনা, অর্থাৎ রূপরসের নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া অতীন্দ্রিয় রসস্বরূপের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা। কেবল তত্ত্বমাত্রসার সাধনায় শুষ্কতা আনে, কেবলমাত্র ভক্তিরসবিহ্বল সাধনায় মাদকতা আনে। এ দুয়ের মিলন চাই। কিন্তু সে মিলন তত্ত্বে হইলে চলিবে না, জীবনে হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই দ্বন্দ্বের সমাধান আমরা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

গীতিমাল্যের শেষ গানগুলিতে তাহার আভাস পাই।—

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু,
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।

পাষাণ দিয়ে বাঁধা বাটে
এই-যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।
কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইশারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ, আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে—
পাখির মুখে এই-যে খবর পেনু।

এ গান কোনো ভক্ত বৈষ্ণবের রচনা হইতে পারিত।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গানের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি। সে গানটি কোনোমতেই কোনো বৈষ্ণবের দ্বারা রচিত হইতে পারিত না—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ,
তার অণুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।…
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

এই নরদেহ গড়িয়া উঠিবার অভিব্যক্তির ইতিহাসের স্তরে স্তরে যে ভগবানের আনন্দলীলা বিরাজিত তাহা উপলব্ধি করা এ কালের কবি ভিন্ন আর কোনো কালের কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় ছিল না। ভগবানের অসীম আনন্দকে সীমারূপের মধ্যে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি বৈষ্ণব কবির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। আবার সেই সীমারূপকে অসীম দেশে ও অসীম কালে ব্যাপ্ত করিয়া সীমার মধ্যে অসীমতাকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি এ কালের ভক্ত কবিদের মধ্যে দেখিতেছি। টেনিসনের Flower in

the crannied wall, ব্লেকের To see a world in a grain of sand, এই শেষোক্ত উপলব্ধির কাব্যের নমুনা। 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ' এই শ্রেণীর কবিতা। ইহা হুইট্‌ম্যান বা এড্‌ওআর্ড্‌ কার্পেণ্টার লিখিতে পারিতেন। এ কাব্য এভোল্যুশনে জীবলীলার কাব্য।

গীতিমাল্যের সম্বন্ধে আমার আলোচনা শেষ করিলাম। গীতিমাল্যের পরে আমরা আর কী শুনিব? কিন্তু কবির প্রার্থনা তো আমরা জানি—

সুরে সুরে বাঁশি পুরে
মোরে আরো আরো আরো দাও তান।

অতএব আমরাও সেই 'আরো আরো আরো'র অপেক্ষায় রহিলাম।

১৩২১

—

৯৯০/বা.

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

মূল্য ২.২৫ টাকা